মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা

হারুন হাবীব

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে আগরতলা হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের অলিখিত রাজধানী। কেবল চৌদ্দ লক্ষ শরণার্থী নয়, রাজনৈতিক ও সশস্ত্র প্রতিরোধ নেতৃত্বের বড় অংশের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিলো আগরতলা। শান্ত নিস্তরঙ্গ পাহাড়ঘেরা মনোরম সৌন্দর্যমণ্ডিত এই অঞ্চলের মানুষ যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে বাংলাদেশের শরণার্থী ও যোদ্ধৃসমাজকে বরণ করেছিলো তার স্বীকৃতি কোথাও তেমনভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। অবশেষে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা ও ত্রিপুরাবাসীর ভূমিকা মূল্যায়নের কাজটি সম্পন্ন করলেন মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক লেখক হারুন হাবীব। গ্রন্থ রচনার কাজে কেবল মুদ্রিত তথ্যপাঠই নয়, তিনি ঘুরে এসেছেন আগরতলা, আলাপ করেছেন বহু বিশিষ্ট ও সাধারণজনের সঙ্গে, সংগ্রহ করেছেন নানা দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র, লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। দীর্ঘ শ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে রচিত হলো 'মুক্তিযুদ্ধ : ডেটলাইন আগরতলা' গ্রন্থ, যাঁদের ভালোবাসা ও সমর্থনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছিলো নির্ভরতার ভূমি ও যুদ্ধের প্রেরণা সেই ত্রিপুরাবাসীর ভূমিকা এই প্রথমবারের মতো লিপিবদ্ধ হলো তার সমগ্র ব্যাপ্তি নিয়ে।

ISBN-984-12-0020-1

মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা

হারুন হাবীব

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

প্রচ্ছদ অশোক কর্মকার
প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, ফাল্গুন ১৩৯৮
ISBN-984-12-0020-1

প্রকাশক মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০
হরফ বিন্যাস জাতীয় কম্পিউটার মুদ্রায়নী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০
মুদ্রক সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ৬৯ নয়াপল্টন, ঢাকা

উৎসর্গ

ত্রিপুরার বন্ধুদের হাতে, মুক্তিযুদ্ধের
বিশ বছর পর

সূচিপত্র

স্মৃতিপত্র

মুখবন্ধ

বাংলা ও বাঙালির অতীত এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে গাঁথা বলে আগরতলা এক প্রিয় নাম আমার কাছে। আগরতলা, সীমান্ত-ঘেঁষা ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী, আমাদের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ভারতীয় ঠিকানা। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য ত্রিপুরার আগরতলা আর উদয়পুরকে আগে কখনো দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধে আমার রণাঙ্গন ছিলো ভিন্ন। তাই একাত্তর সালেও আগরতলা দেখা হয়ে ওঠেনি আমার।

চোখে না দেখেও আগরতলাকে দেখেছিলাম ইতিহাসে। ত্রিপুরার মহারাজাদের বাঙালি-প্রীতি ইতিহাসের সম্পদ। সেই সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এতদঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার ভেতরে একমাত্র ত্রিপুরাই বার কয়েকের জন্যে স্মৃতিধন্য হয়েছিলো রবীন্দ্র ভ্রমণে, সুদীর্ঘকালের সংযোগে। রবীন্দ্র সাহিত্যেরও একটি অংশ জুড়ে আছে ত্রিপুরার রাজা-মহারাজা আর তাদের অতীত জীবন।

বর্তমান গ্রন্থটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ দলিল। এতে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের বৃত্তান্ত ততোটা নেই, যতোটা আছে ত্রিপুরার সীমান্তে, বিশেষত আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার উদ্যোগ সংক্রান্ত বিবরণ। আগরতলা, এক অর্থে ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানী। অবিভক্ত চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেটের বেশকিছু অংশ এবং রাজধানী ঢাকা থেকে দেশত্যাগী বাঙালিদের বিদ্রোহী বাঙালি, ইপিআর, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিলো আগরতলা। একদিকে খুলনা-যশোর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত, অন্যদিকে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ত্রিপুরার সীমান্ত-এই ছিলো মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-পরিচালকদের প্রাথমিক ঠিকানা।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হিসেবেই শুধু নয়, আগরতলা খ্যাত হয়েছিলো আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলো আগরতলা বাঙালির প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়েরের ফলে। আগরতলাকে ষড়যন্ত্রে জড়িয়েছিলো পাকিস্তানি সেনাপতি শাসকেরা বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহাকে দমন করার লক্ষ্যে। এই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামী দেশপ্রেমিক সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করেছিলো পাকিস্তানিরা ঢাকা সেনানিবাসে রাতের অন্ধকারে। এই আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করেই ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা হয়েছিলো বাঙালির স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, সেই আগরতলাই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে হয়ে উঠেছিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 'ডেটলাইন'।

ত্রিপুরা বা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বেশ.ক'টি রাজ্য প্রায় এক যুগ আগে থেকে

'রেসট্রিকটেড এরিয়া' অর্থাৎ যে কোনো বিদেশীরই এই রাজ্যগুলোতে গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত। ভ্রমণের আইনগত জটিলতার কারণে দীর্ঘকাল থেকেই সীমিত সংযোগ ঢাকা ও আগরতলার মধ্যে।

অনেক ক্লেশে, বোধ করি মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় অঞ্চলটিকে একবার অন্তত চাক্ষুস করার দুর্বার ইচ্ছেতেই, আগরতলা যাওয়া হয়েছিলো আমার সম্প্রতি। কিন্তু বিশ বছর আগেকার সেই আগরতলা এখন পরিবর্তিত, বললেন সবাই। গাছপালা কমে গেছে, দালানকোঠা উঠেছে অনেক। নতুন রাস্তাঘাট হয়েছে। কিন্তু এই ছোট্ট শহরটির ভালোবাসার হৃদয় অটুট আছে আজো।

অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি বইটির মালমসলা সংগ্রহ করতে গিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের দিনে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের নাম শোনেননি এমন মানুষ খুব কম ছিলেন বাংলাদেশের, অন্তত যাঁরা আগরতলা গিয়েছিলেন। সেই অনিল বাবু আর তাঁর স্ত্রী সানন্দা ভট্টাচার্যি সব কাজ ফেলে রেখে আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন আগরতলা, উদয়পুর আর বিলোনিয়া। বাবুনের কথা যতো কম বলা যায় ততোই মঙ্গল। 'শাশ্বত' খ্যাত সাংবাদিক সুধীর ভৌমিক নিয়ে গেলেন অফিস–আদালতে, এবাড়ি–ওবাড়িতে, যেখানেই রক্ষিত আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতি আর কাগজপত্র। ত্রিপুরার প্রাচীন এবং জনপ্রিয় দৈনিক 'সংবাদ' –এর মালিক–সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক খুলে ধরেছিলেন সামনে তাঁর সংগ্রহের যাবতীয় পত্রিকার পুরনো ফাইল। কলেজ ছাত্রী শান্তা ভৌমিক দীর্ঘ সময় ধরে আমার জন্যে কপি করে দিলেন পুরনো খবরাখবর আর তথ্যাদি। ফকরুদ্দিন আর আকবর আহমদ হাসি মুখে দায়িত্ব পালন করে গেলো প্রয়োজনীয় যোগাযোগ আর দৌড়ঝাপের। উদীয়মান সাংবাদিক সৈয়দ সাজ্জাদ আলী টিটন আর জয়ন্ত ভট্টাচার্যি সাহায্য করলেন যখন যেখানে যা কিছু প্রয়োজন, সব ব্যাপারে। আর সর্বাত্মক সাহায্য করলেন 'ত্রিপুরা দর্পণ' – এর সম্পাদক সমীরণ রায়।

সেই সাথে ছিল বাঙালির বিস্ময়কর আতিথেয়তা। সুবীর আর অনিল দা'র বাসাতেই ক'দিনের আশ্রয়। মাত্র ক'দিনের ভ্রমণ। এরি মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন অসংখ্য মানুষ—কবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, গৃহিণী, ছাত্র। আমি স্পষ্টতই বুঝে নিলাম, আগরতলার এই হৃদয়ের তুলনা নেই। বাঙালির এই সহজাত প্রেমিক হৃদয়ের জন্যেই হয়তোবা লক্ষ লক্ষ বাঙালি শরণার্থী নির্বিঘ্নে আশ্রয় পেয়েছিলো ত্রিপুরা আর সীমান্ত–ঘেঁষা ভারতীয় অঞ্চলে।

এই গ্রন্থে অনেকের নামই উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এটা ঘটেছে মূলত আমার তথ্য সংগ্রহজনিত সীমাবদ্ধতা আর সময়ের স্বল্পতার কারণেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নয়। আমি শুধু একটা ভূমিকা টানবার চেষ্টা করেছি আগরতলাকে ঘিরে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের।

আমার নিজের লেখার বাইরেও বেশকিছু স্মৃতি তর্পণ জুড়ে দেয়া হয়েছে বইটিতে। শ্রদ্ধেয় শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, ১৯৭১–এ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, লিখেছেন পুরনো স্মৃতি ঘেঁটে। স্মৃতি ধারণ করা হয়েছে বরণীয় বেশ ক'জন মুক্তিযোদ্ধার এবং আগরতলার সংশ্লিষ্ট ক'জনের। আমার বিশ্বাস, এই লেখাগুলোর ভেতর দিয়ে এমন একটা ছবি উঠে আসবে, যে ছবি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অলিখিত উজ্জ্বল উপ্যাখ্যান।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

হারুন হাবীব

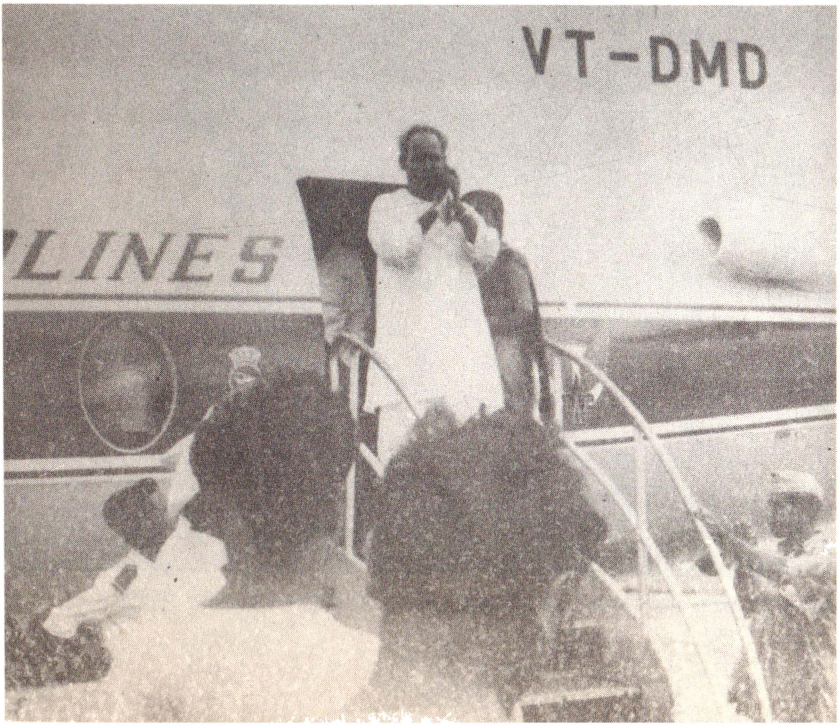


মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ত্রিপুরার এক গেরিলা শিবিরে



ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ বাংলাদেশের শরণার্থীদের ক্যাম্প ঘুরে দেখছেন। ছবি : *চিত্ত সেন*

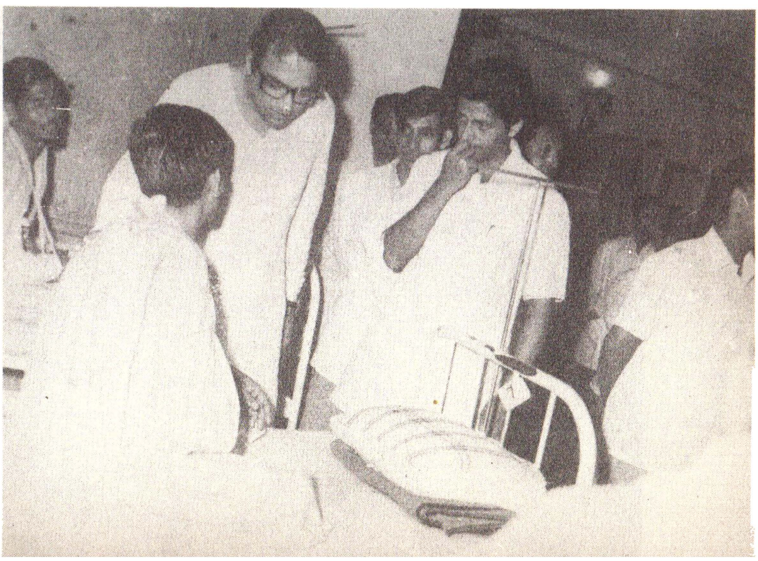
৪ এপ্রিল, ১৯৭১। শরণার্থী ও নব-গঠিত মুক্তিবাহিনী বিষয়ে কেন্দ্রের সাথে সফল আলোচনা শেষে দিল্লী থেকে আগরতলায় ফিরছেন মৃখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ





শরণার্থী বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্র সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড কেনেডী আগরতলায় দেশত্যাগী লাখো বাঙালির দুরবস্থা দেখছেন

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পাকিস্তানী বুলেট–বোমায় আহতদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন ত্রিপুরার শিবিরে। ছবি *চিত্ত সেন*





বাংলাদেশের শরণার্থীদের মাঝে
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
ছবি চিত্ত সেন

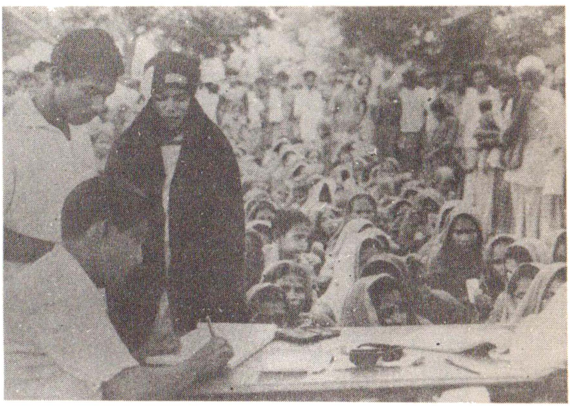
আগরতলার এক শরণার্থী
শিবির দেখে ফিরছেন
এডওয়ার্ড কেনেডী

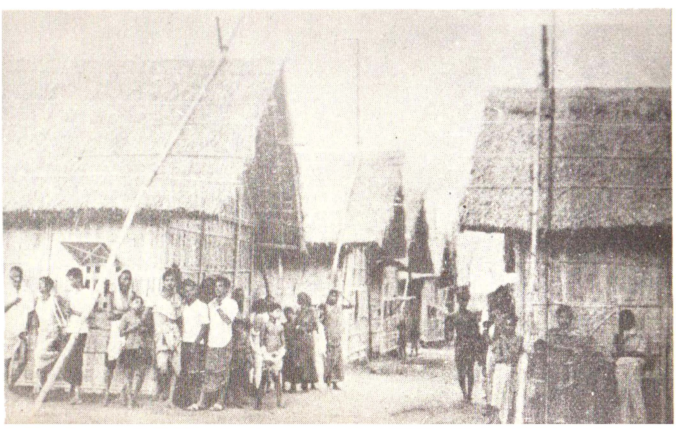




আগরতলার হাসপাতালে পাকিস্তানি নির্যাতনে পঙ্গু বাংলাদেশের যুবক

ত্রিপুরার শিবিরে লাখো শরণার্থীর একাংশ



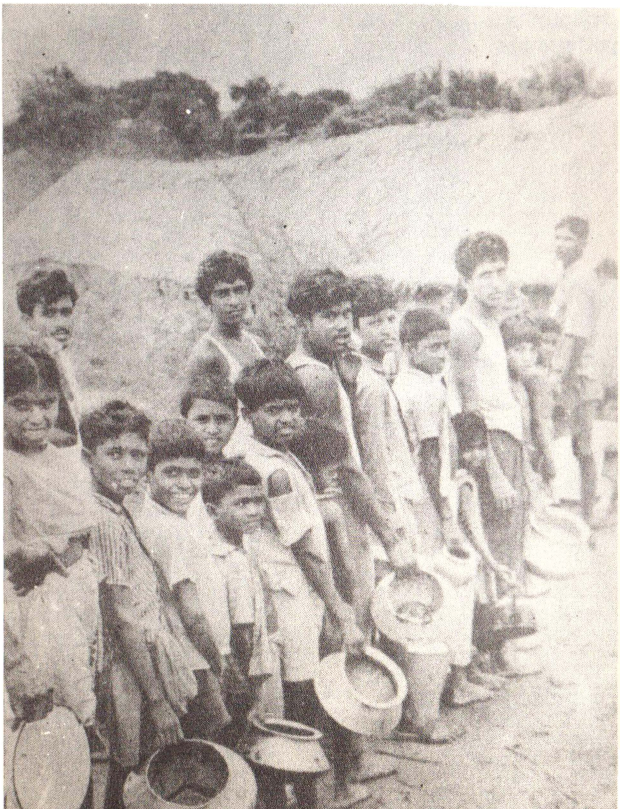


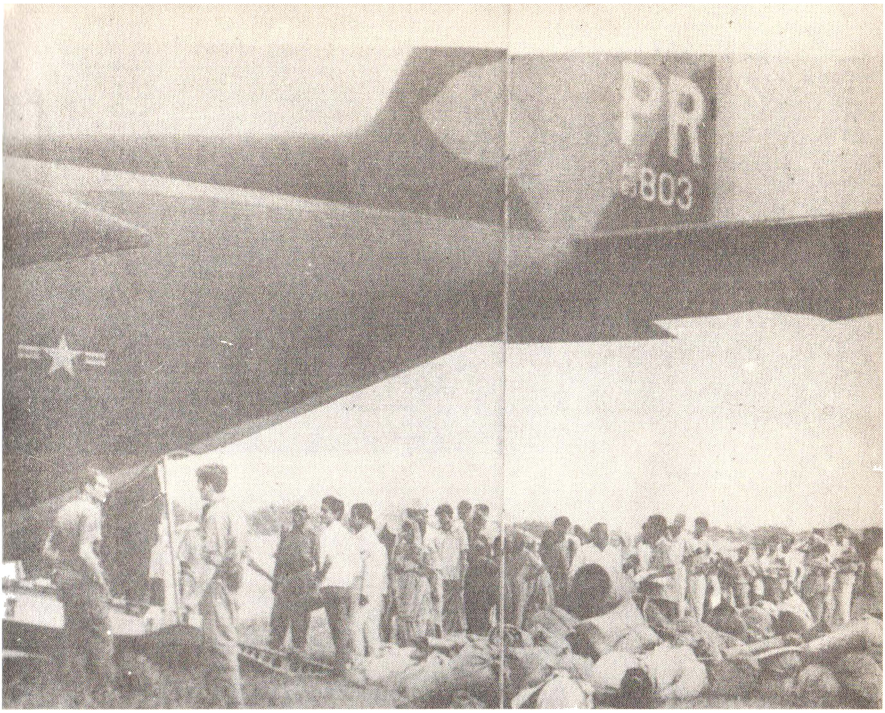
বর্বর পাক-হানাদার বাহিনীর নির্যাতনে দেশত্যাগী শরণার্থীদের এভাবেই সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চলে



দুঃসহ শরণার্থী জীবন, ত্রিপুরার
একটি স্কুল ঘরে সদ্য দেশত্যাগী
একদল বাঙালি নারী

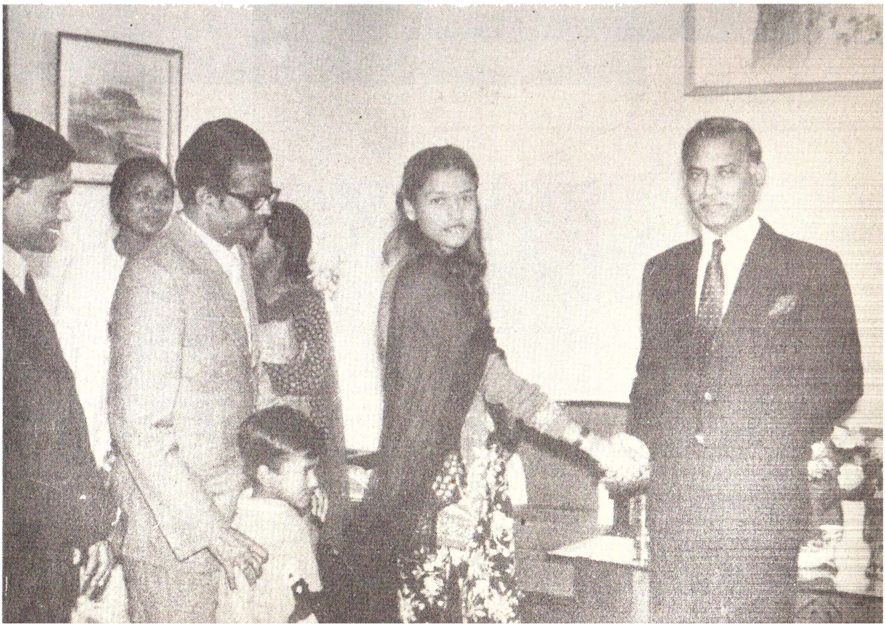
পার্বত্য রিফুজি ক্যাম্পে ারণার্থী
শিশুরা পানির সন্ধানে



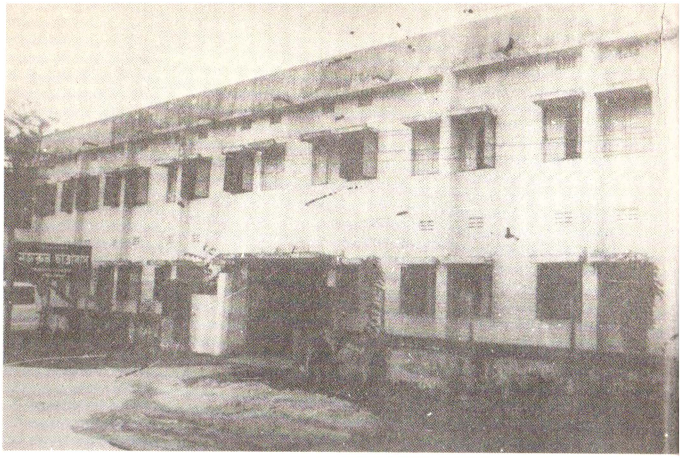


স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে ত্রিপুরা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশের শরণার্থীদের

মুক্তিযোদ্ধা, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, রাষ্ট্রীয় অতিথি করে ঢাকায় এনেছেন আগরতলার অনিল ভট্টাচার্যি ও তাঁর পরিবারকে



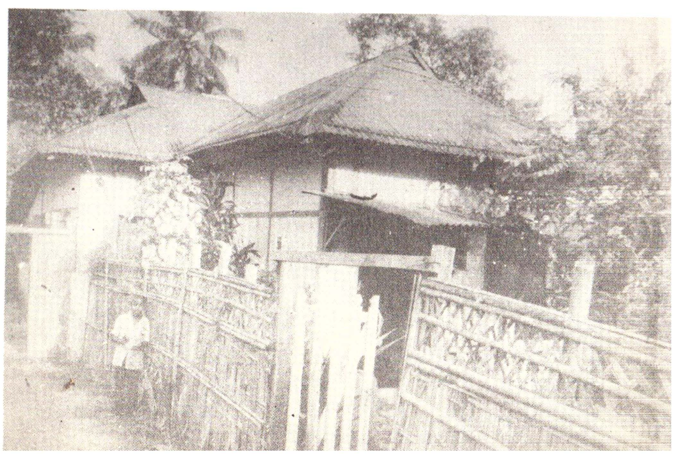
পুরনো এম.এল.এ হোস্টেল, বর্তমানে নজরুল ছাত্রাবাস। এই হোস্টেলটিই ছিল আগরতলায় আওয়ামী লীগ গণপ্রতিনিধি ও মুক্তি–যোদ্ধাদের প্রধান ঘাঁটি। ছবি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, আগরতলা





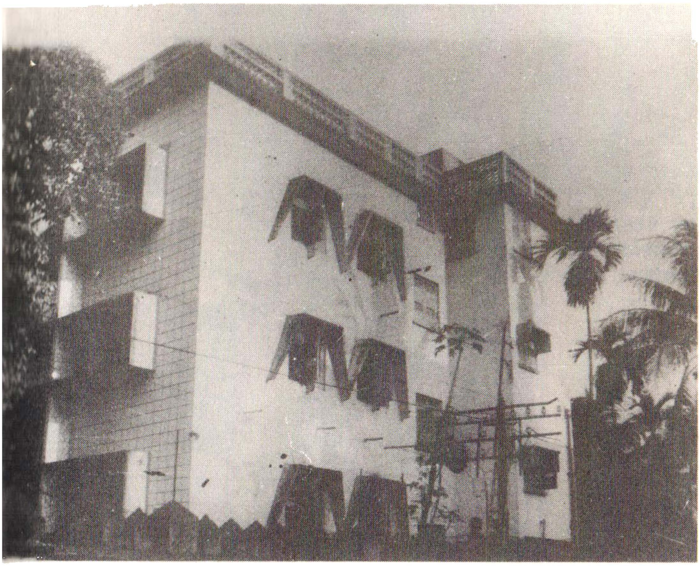
শ্রীধর ভিলা, আগরতলা, মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রলীগ নেতাদের মূল ঘাঁটি। ছবি তপন দেবনাথ

মেলার মাঠে অনিল ভট্টাচার্যি ও সুনন্দা ভট্টাচার্যির ঐতিহাসিক বাড়ি। ১৯৭১ সালে এই বাড়িটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের ব্যস্ত কর্মস্থল। ছবি তপন দেবনাথ



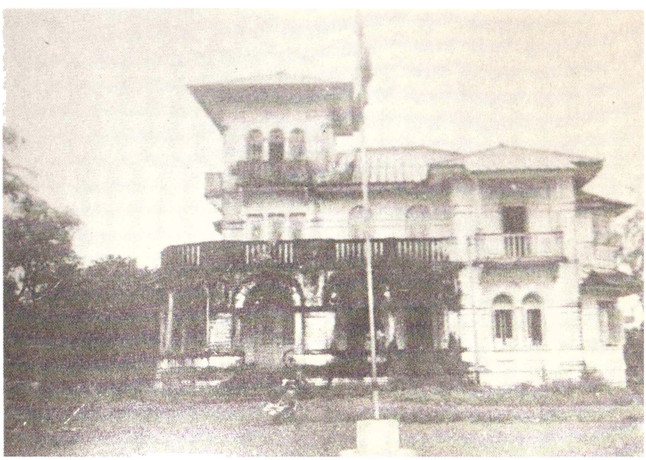


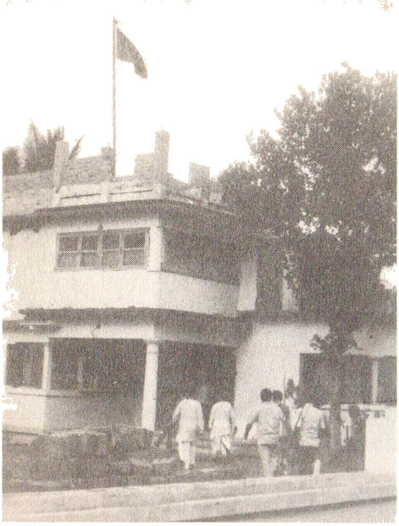
[illegible]তলা সার্কিট হাউস। [illegible]নেই প্রবাসী সরকার [illegible] চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত [illegible] ছবি জয়ন্ত ভট্টাচার্য



নীরেন ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক বাড়ি। এপ্রিল মাসে (১৯৭১) এই বাড়িতে বসেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ এবং বিপ্লবী সরকারের কর্মতৎপরতা সম্পন্ন করেন। ছবি তপন দেবনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য আগরতলার মালঞ্চ নিবাস ছবি জয়ন্ত ভট্টাচার্য



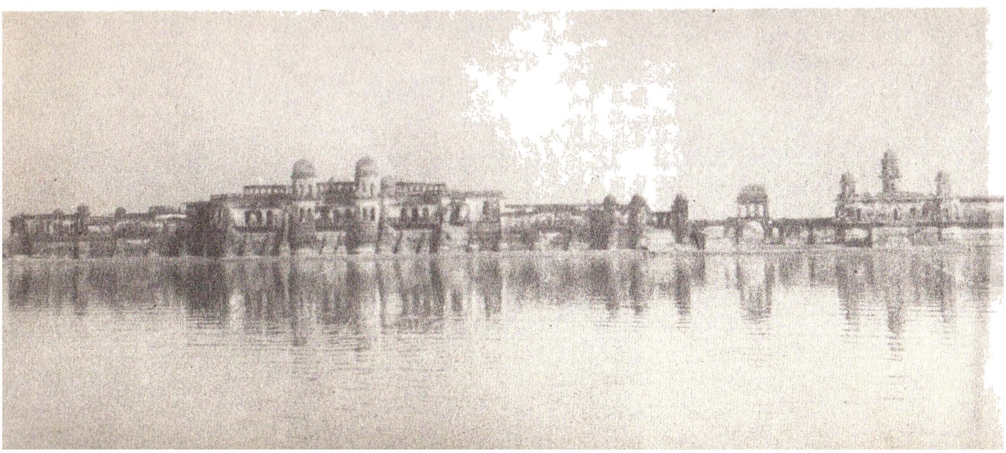


মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত আগরতলার 'বাংলাদেশ ভবন'

১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তানিদের হাত থেকে সদ্যমুক্ত বেগম শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু পুত্র মুক্তিযোদ্ধা জামাল, শিশুপুত্র রাসেল এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের কয়েকজন সদস্য-সদস্যা। ছবিটি ভারতীয় সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যির সংগ্রহ থেকে নেয়া



ত্রিপুরার মহারাজাদের ঐতিহাসিক 'নীরমহল'। এখানেও গড়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনীর শিবির





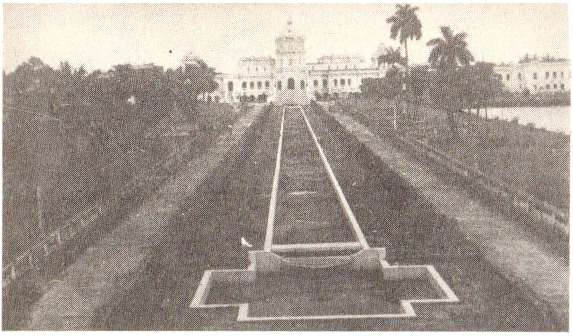
পাকবাহিনী আর আলবদর রাজাকারের ভয়ে ভীত হয়ে দেশ ছাড়ছে বাঙালি জনতা



এমবিবি কলেজ। মুক্তিযুদ্ধের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও যুব প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রধান ঘাটি ছবি সুজিত দেব রায়

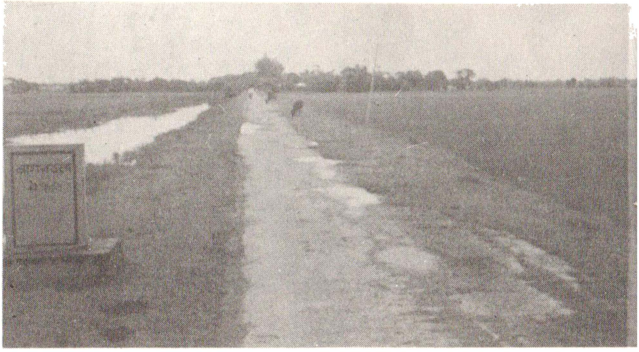
আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর নিহত সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিফলক ছবি সুজিত দেব রায়





আগরতলার রাজবাড়ি। ত্রিপুরায় বাংলা ও বাঙালি অধিবাসনে যে রাজবাড়ি ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। ছবি সুজিত দেব রায়

বাংলাদেশ ভূখণ্ড সংলগ্ন রাজধানী আগরতলা। ছবি হারুন হাবিব



প্রথম সপ্তাহ, ডিসেম্বর, ১৯৭১। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী দুর্বার বেগে প্রবেশ করছে আখাউরা সীমান্ত দিয়ে





১০ জানুয়ারি, ১৯৭২, পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে দেশে ফেরার পর মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ও বিমানবাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার পরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু। ছবিটি অনিল ভট্টাচার্যির সংগ্রহ থেকে নেয়া

শেখ মুজিবের মুক্তি চাই

স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সাপ্তাহিক

স্বাধীনতা

১৭ই শ্রাবণ, ১৮৯৩ শকাব্দ ; ২
বৃ ; ৮ই আগষ্ট, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এই সংসদ গভীরভাবে দ্বিগ্ন। বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠরোধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের উপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে। নির্লজ্জভাবে সেনাবাহিনীর রাইফেলের বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, কামান ও সামরিক বিমান ব্যবহার করে পূর্ব বাংলার মানুষের শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের সীমান্তের এত নিকটে সংগঠিত এই মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এই সংসদ নীরব থাকতে পারে না। একটি নিরস্ত্র ও নিরীহ জাতির উপর যে ব্যাপকভাবে অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে আমাদের দেশের জনগণ এর তীব্র নিন্দায় ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

গণতান্ত্রিক জীবনধারা অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষের এই সংগ্রামের প্রতি এই সংসদ আন্তরিক সহানুভূতি ও একাত্মতা জ্ঞাপন করছে।

এই সংসদ অবিলম্বে অসামরিক জনতার উপর থেকে এই বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের অবসানের দাবী জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই সুপরিকল্পিত গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই সংসদ বিশ্বের সমস্ত জাতি ও সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

এই সংসদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক জাগরণ জয়যুক্ত হবেই। ... এই আশ্বাস দিতে চায় যে, তাঁদের সংগ্রামে ... ও ভারতবাসীর গভীর সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন ...

সংসদের উভয় সভায় গত ৩১শে মার্চে গৃহীত প্রস্তাব।

প্রচণ্ড আক্রমণ ...

নেপাল

... দেশের সংবাদপত্রে ... সামরিক শাসক গোষ্ঠীর পুঃ ... অবশ্যম্ভাবী ... মন্তব্য করেছেন।

লণ্ডনের সানডে টাইমস ... নিন্দা মন্তব্য করেছেন যে এটা ... পূর্বেই স্পষ্ট যে 'পাকিস্তানের' মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সামরিক হামলা দিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না।

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংগ্রাম কমিটির বুলেটিনে আবেদন

গত ২৭শে মার্চ—ঢাকা থেকে প্রচারিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির বিশেষ বুলেটিনে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে 'পশ্চিমী হানাদারদের খতম করার' আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে ভাইসব 'আমরা স্ব- ... লড়ছি। ...

ত্রিপুরা-বাংলা সীমান্তে দাঁড়িয়ে

সাংবাদিকের চোখে

সোনাম্‌ড়া থেকে বক্সনগর পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্তের প্রতিটি চেক পোষ্ট ঘুরে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন বাংলাদেশের নারী ও শিশুরা ভারতীয় সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে সরে এসেছেন। এবং সবল সুস্থ পুরুষ বীরবিক্রমে পাক সৈন্য প্রতিহত করেছেন।

তিনি জানাচ্ছেন সীমান্তে মতিনগর চেকপোষ্টে শ্রীওতা নামে এক জাপানী টেলিভিশন ...

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক সংবাদ
DAINIK SAMBAD

মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যয় শুরু

গেরিলা আক্রমণে ...

পাক হানাদার ...

জয় বাংলা
JAI BANGLA

(অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক)

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—শ্রীপ্রফুল্ল রঞ্জন সরকার

ঃ জয় বাংলা ঃ

'জয় বাংলার' শেষ সংখ্যা ঃ 'জয় বাংলার' প্রচার বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অত্যাসন্ন ঃ

আগরতলা ১৬ই জুন ॥ নির্ভরযোগ্য সরকারী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ ...

'জয় বাংলার' গ্রাহক, ... ও সমর্থকগণের ...

জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার : ত্রিপুরা সরকার।

মুক্তি ফৌজের বিজয় অভিযান অব্যাহত

পাক-শত্রু সৈন্যের পরাজয় শুরু ঃ আকাশ থেকে বোমার আশ্রয় ঃ ঢাকায় বার্লিনের মত যুদ্ধ

পোড়ামাটি নীতির আশ্রয় ঃ মুক্তি যোদ্ধারা আরো সংহত তেজোদীপ্ত

Postal Regd. No. A 345

দৈনিক সংবাদ
DAINIK SAMBAD

... ২৮শে মার্চ, '৭১ইং

আগরতলা ২৮শে মার্চ ॥ বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ... পাক সৈন্যকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে চলেছে ...

সমর্থনে মিছিল

পাক সৈন্যের বর্বর আচরণ

আগরতলা ২৮শে মার্চ ...

ত্রিপুরা বাসীর দাবী

মুক্তি সংগ্রামীদের উপর সামরিক হামলাবাজ ব 'নিন্দায়' বিদেশী সংবাদপত্র মুখর

আমেরিকা, জাপান

ইতিহাসে গাঁথা নাম

বাংলাদেশের সাথে আগরতলা ইতিহাসে গাঁথা নাম। পূর্ব বাংলার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে ৬-দফা পেশ করার প্রায় সাথে সাথেই পাকিস্তানি ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। একদিকে যেমন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত জেগে ওঠে বাঙালি, ৬-দফার শ্লোগানে কেঁপে ওঠে বঙ্গভূমি, অন্যদিকে তেমনি হৃৎকম্পন শুরু হয়ে যায় শোষক পাকিস্তানি সামরিক জান্তার। দিন যতই যেতে থাকে, ধর্মের বর্ম গায়ে–দেয়া গণবিরোধী শাসকচক্রের চোখে পাকিস্তানি অখণ্ডতার পয়লা নম্বরের দুশমন হয়ে ধরা পড়তে থাকেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেই সাথে শুরু হয়ে যায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কি সত্যি ছিলো ? শেখ মুজিবুর রহমান এবং তৎকালীন দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা কি চেয়েছিলেন তাদের সামগ্রিক সংগ্রামের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশের সাহায্য নিয়ে হাজার মাইল দূরের প্রায় উপনিবেশবাদী পাকিস্তানের দাসত্ব হটাতে ? এ প্রশ্নের জবাব দেবার মালিক আমি নই। এর উত্তর খুঁজবেন ইতিহাসবেত্তারা। আমি শুধু বলবো, আগরতলাকে ঘিরে ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের প্রশাসন শেখ মুজিবসহ বেশ ক'জন বাঙালি সৈনিক ও বেসামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছিলেন সেই মামলার উদ্দেশ্য ছিলো বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করা। সেই ঐতিহাসিক মামলার সূচনা করে পাকিস্তানি ধর্ম-ব্যবসায়ী সামরিক ও বেসামরিক উচ্চাভিলাষীরা শুধু শেখ মুজিব ও বাঙালি দেশপ্রেমিকদের চরিত্র হননের অপচেষ্টাই করেননি, তাঁদের শুধু হত্যাই করতে চাননি, সেই সাথে আমাদের পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারতকে জড়িয়ে বাংলার স্বাধীনতাকামী শক্তিকে আঁতুড় ঘরেই গলা টিপে মারার ফন্দি এঁটেছিলেন।

কিন্তু ওদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। স্বাধিকারের জন্য চলমান আন্দোলন বেগবান হয়ে অপ্রতিরোধ্য রূপে যখন শহর–বন্দর-গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন আইয়ুব খানদের লেজ গোটানো ছাড়া আর উপায় থাকেনি। তথাকথিত আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হককে রাতের অন্ধকারে তারা গুলি করে হত্যা করে। বাঙালি দেশপ্রেমিকের রক্তে রাঙিয়ে তোলা হয় ভোর রাতের ঢাকা সেনানিবাস। মুজিবের ভাগ্য নিয়ে অপরিসীম দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় দেশবাসী। কিন্তু এর বেশি আর এগুনো সম্ভব হয়নি স্বৈরাচারের পক্ষে। আগরতলা ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এস. রহমানের বাড়ি পর্যন্ত যখন বিক্ষুব্ধ জনতা আক্রমণ করে বসে, গ্রাম-গঞ্জ-শহরে যখন 'গণশত্রু' নিধনের মহড়া চলতে থাকে, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়, শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি যখন বাঙালির বুক-নিঙড়ানো আকাঙ্ক্ষার অলংঘনীয় দাবিতে পরিণত হয়, তখন উঠিয়ে নেয়া হয় সব অভিযোগ।

মামলা তুলে নিয়ে সসম্মানে মুক্ত করে দেয়া হয় মুজিবকে। শেখ মুজিবুর রহমান রাতারাতি হয়ে ওঠেন 'বঙ্গবন্ধু'। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ উপাধি দেয় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু'। প্রথমবারের মতো পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিবের নামের আগে লেখা হতে থাকে 'বঙ্গবন্ধু'—বঙ্গভূমির বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখনো মনে পড়ে, সেদিনকার 'আজাদ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল কাঠের হরফে যখন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি–শোভিত প্রাসঙ্গিক খবরসহ ব্যানার হেডিং বের হয়, পরবর্তীকালে অন্যান্য কাগজেও, তখন কেবল শেখ মুজিবের জন্য নয়, সারা বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য সবার অলক্ষ্যেই যেনো ভারতের 'আগরতলা' একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে ওঠে। আর শেখ মুজিব কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রবল স্বাধীনতা স্পৃহার। পরিণত হন শৃঙ্খল মুক্তির সুউজ্জ্বল প্রতীকে।

তাই বলি, বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে আগরতলা নামটি পাকিস্তানিরা যেভাবে একটা 'ষড়যন্ত্রের' সঙ্গে যুক্ত করে প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলো, শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা ধোপে টেকেনি। আগরতলা নামটি পরিণত হয় এক স্মরণীয় নামে; বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ আর ঘটনা যা হয়ে ওঠে তার এক অবিভাজ্য অংশে, পালন করে সে ১৯৭১–এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রধানতম কেন্দ্রস্থলের ভূমিকা।

সেই ধর্মনগর থেকে সাব্রুম—ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কাছে, কী জাতি, কী উপজাতি সেদিন 'জয়বাংলা' ছিলো এক ভালোবাসার নাম। ছোট্ট একটি রাজ্য, ভারতের অন্যতম পিছিয়ে পড়া একটা রাজ্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—সেই ত্রিপুরার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিলো ভৌগোলিক-ব্যবচ্ছেদে বিভক্ত আরেক ভূখণ্ডে বসবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্যে প্রায় এক বছরের প্রচণ্ড এক যুদ্ধ !

ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানটাও অদ্ভুতভাবে গাঁথা বাংলাদেশের সাথে। ভারত যেখানে তিন দিক থেকে বেঁধে রেখেছে বাংলাদেশকে—বাংলাদেশ সেখানে তিন দিক থেকে আলিঙ্গন করে আছে ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার মোটামুটি ৯১৭ কিলোমিটার সীমান্তের ভেতর ৮৩৯ কিলোমিটার বাংলাদেশের সঙ্গে। বাদ বাকি ৫৭ কিলোমিটার আসাম আর মাত্র ২১ কিলোমিটার মিজোরামের সঙ্গে।

আর সে কারণেই পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে পশ্চিমবাংলা, আসাম ও মেঘালয়ের চাইতে আগরতলা তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিকা বা অবদানই ছিলো সবচাইতে বেশি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলার আশ্রয়-ঘাঁটি রাজনৈতিক ও যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো রাজধানী ঢাকার সঙ্গে তার ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণেই। ঢাকা থেকে ট্রেনে চেপে কুমিল্লার আখাউড়া যাওয়া মানেই আগরতলার বুকের ভেতরে ঢুকে পড়া। সড়কপথে বোধ করি দু'ঘন্টা সোয়া দু'ঘন্টার যাত্রাতেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে—এতই কাছাকাছি আগরতলা। বাংলাদেশের সাবেক অবিভক্ত জেলা সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর সীমান্ত-ঘেঁষা বলে মুক্তিকামী বাঙালি সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ লাখ দেশত্যাগী মানুষ এইসব জেলা থেকে স্রোতের মতো প্রাণ বাঁচাতে সেদিন ঢুকে পড়েছিলো ত্রিপুরায়।

একটা হিসেব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বাংলাদেশের যুদ্ধের দাহন ভোগ করেছিলেন কতটুকু। ১৯৭১ সালে সমগ্র ত্রিপুরায় বাঙালি ও উপজাতির সংখ্যা মিলে যেখানে ছিলো সর্বমোট ১৫.৫৬ লক্ষ, সেখানে বাংলাদেশ ত্যাগী শরণার্থীর সংখ্যা ছিলো ১৩.৪২ লাখ। প্রায় সমান সমান। শরণার্থীদের এই সংখ্যাটা পরবর্তীকালে আরও বেড়েছিলো এবং স্বভাবতই ত্রিপুরার জনজীবন ও অর্থনীতিতে সৃষ্টি করেছিলো প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার। এরপরও, সততার খাতিরেই বলতে হয়, বোধ করি শুধু বাঙালিত্বের টানেই কষ্টকে কষ্ট বলে ভাবেননি ত্রিপুরাবাসী। শত শত বছর ধরে অথবা সাম্প্রতিককালেও, ত্রিপুরাতে যে বাঙালি জনসংখ্যার বাস তার ৯৫ ভাগের মতো অধিবাসী এই বাংলার। তাঁদের ভাষা যেমন এক ও অভিন্ন, তেমনি কৃষ্টি ও সভ্যতা, কেবল কিছুটা ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ছাড়া, প্রায় সবই এক। এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বিরাগ আর ধর্মাচারের রূপ-বৈশিষ্ট্যও এক ও অভিন্ন। ধর্মের ব্যবধান এখানে বাদ সাধেনি এতটুকু। তাই বিশাল হিন্দু এবং পাহাড়িয়া উপজাতি আর নানা ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর ভেতরে বাংলাদেশের এক বিপুলসংখ্যক দেশত্যাগী হিন্দু-মুসলমান নির্বিবাদে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলো– মানুষের ভেতরে মানুষ যেভাবে পায়, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের দিনে আগরতলায়। ধর্মীয় বিশ্বাস এই আত্মীয়তা আর মূল মানবিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোনো রকম

বিভাজন রেখা সৃষ্ট করতে পারেনি। ধর্ম যে ব্যক্তির একান্ত আপন আচারযোগ্য বিষয়, রাষ্ট্রের বা সমাজের নয় এবং ধর্মের বিশ্বাস যে ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভাজন টানে না, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত সময় সেটা আবার নতুন করে শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের।

বৃটিশ উপনিবেশবাদী আমলে আমরা আমাদের 'বাঙাল' বলতাম। বলতাম না শুধু, রীতিমত অহংসর্বস্ব বা গরিমাময় ছিলো সেই উচ্চারণ। ধর্মের বাঁধন বা বাধা তখন যে ছিলো না, তাও নয়। ছিলো, কিন্তু বাঙালিত্বটাই ছিলো মুখ্য। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরেও আমাদের জাতীয়তা পাকিস্তানি হয়ে যায়নি, যদি হতো তা'হলে অন্তত বাংলাদেশ নামের দেশটির জন্ম হতো না। বাঙালি যখন ইউরোপে বসবাস করেন তখন তিনি বাঙালি থাকেন। আমেরিকা বা আফ্রিকার যেখানেই থাকুন কিংবা বসবাস করুন, নাগরিকত্ব নিন, তাতে তার জাত-পাতের পরিচয়টুকু মুছে যায় না। তাই সীমান্তের ভৌগোলিক বিভাজন রেখা জাতের বিভাজন নয়-শারীরিক দূরত্ব মাত্র। ভাষা ও সংস্কৃতির নৈকট্য রাজনৈতিক কারণে আইনের সীমান্ত মানলেও মানতে পারে—মনের সীমান্ত কি মানে ?

আমাদের মুক্তিসংগ্রামীরা একাত্তরে অন্তত বৈরী প্রতিবেশী পাননি। বোধ করি দেশ থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ সে কারণেই পাড়ি দিতে পেরেছিলেন সীমান্ত। পরিবেশটা সুবিধেজনক ছিলো আরও একারণে যে, কী পশ্চিমবাংলা, কী আসাম, কী মেঘালয়, কী ত্রিপুরা—সব সীমান্তেই তাঁরা পেয়েছিলেন বাংলা ভাষাভাষী প্রায় একই ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারার মানুষ। সে কারণেই প্রায় ন'টি মাস ধরে পরদেশে বসবাস করেও ঘরছাড়া শরণার্থী জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ছাড়া, বড়ো বেশি কষ্টের স্মৃতি তাঁদের নেই। তবে দেশত্যাগী হবার যে হৃদয়-ছেঁড়া যাতনা, সর্বস্ব ফেলে কেবল জীবন নিয়ে পালিয়ে যাবার অব্যক্ত বুক ফাটা যন্ত্রণা, অনিশ্চিত অজানায় যাত্রার যে কষ্ট, সেটা অবশ্যই ছিলো।

১৯৭১-এ পাকিস্তানি স্বৈরশাসক এবং উপনিবেশবাদীরা বাঙালিদের ঘরছাড়া করেছিলো এবং সেটা করেছিলো মহান ধর্মের কথা বলে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার কথা বলে, বাঙালিরা মুসলমান হতে পারেনি এই অভিযোগ তুলে। কিন্তু ইতিহাসের গতি কোনোদিন ধর্ম-ব্যবসায়ীদের আয়ত্তে থাকেনি। থাকেনি একাত্তরেও। বাঙালির সেদিনকার যুদ্ধ ছিলো তাই মানুষ হিসেবে অমানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক যুদ্ধ, জাতি হিসেবে তার স্বকীয়তা আর মানসম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকবার ও বাঙালিত্ব রক্ষার যুদ্ধ।

বাঙালির তৃতীয় ভুবন

আমি সেকালের আগরতলায় যাইনি। একালের অর্থাৎ ১৯৭১ সালের আগরতলাতেও নয়। তবে বাংলাদেশ সৃষ্টির কুড়ি বছর পর বাঙালির এই তৃতীয় ভুবনে গিয়ে শত বছর আগেকার আগরতলা দেখার ইচ্ছে হয়েছিলো আমার। সেই পুরনো কালের আগরতলা। রাজা-মহারাজাদের আগরতলা।

শুনেছি, পাহাড়ি প্রকৃতির কোল জুড়ে হাজার বছর আগে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে আজকের আগরতলার বস্তিতে। রাজপ্রাসাদ গড়েন মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য। এও শুনেছি, লায়ন্স গেট থেকে সেন্ট্রাল রোড ধরে এগুলে অল্পক্ষণ পর যে জ্যাকসন গেট পড়ে—এসব কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না একদিন। এই শহরে, এখনো যে শহর প্রাণময় প্রকৃতির কোলে একটা বড়ো গ্রাম স্বরূপ, পাহাড় থেকে হাতির দল নেমে আসতো সুদীর্ঘ পথ ভেঙে, উঁচু পাহাড়ের জনজীবন থেকে ফসল নিয়ে আসতো 'বৈনারী'। মালঞ্চ নিবাসের ফুলবাগান থেকে ফুল তুলতে তুলতে কিশোর বালকের বিস্মিত চোখে পড়তো মন-ভোলানো পরীরানী। মূর্ছা যেতো সে। সেদিনকার জে.বি. হাসপাতাল, আজকের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল—এ এলাকার কাঁঠালবন আর নাগকেশর ফুলের বাগান নাকি ছিলো ঘন অরণ্যের মতো। হারিয়ে যাওয়া যেতো সেখানে অনায়াসে। লুকিয়ে থাকা যেতো সে অরণ্যে যতক্ষণ খুশি।

এই সেই আগরতলা যেখানে আর্যদের পা পড়েনি, আসেনি কোনো বিদেশী। আসেনি মোগল, পাঠান এমন কি ইংরেজ। তাই তেমন অর্থে বিদেশীর হাতে লুণ্ঠিত হয়নি এই নগরী আর সব ভারতীয় নগরীর মতো। পুরনো আগরতলা থেকে নতুন আগরতলার পত্তন হয়েছে ধীরে ধীরে। নতুন আগরতলার জনকের নাম মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। এই শহরেই একদিন তরুণ বরীন্দ্রনাথ এসে উঠেছিলেন। তারিখটা জানা নেই। তবে বঙ্গাব্দ ১৩০৬। দ্রুত অপসৃয়মাণ এই চলমান শতাব্দীর সেটা প্রথম বছর। নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথ মোগড়ার রেল স্টেশনে, আখাউড়া বা তার কাছাকাছি।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাথে ত্রিপুরার মহারাজাদের যোগসূত্র অনেক কালের। সেই যোগসূত্রকে চিরস্থায়ী সুখ-দুঃখের সম্পর্কে নিবিড় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে আরেক ইতিহাস। তবে এই সম্পর্কের ভিত্তিমূলে যা ছিলো, অন্তত আমার যা মনে হয়, সেই থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রীতি। সারা বাংলায় যখন বাংলা ভাষার সরকারি মর্যাদা ছিলো না, ফার্সি এবং ইংরেজি যখন সবকিছুর ওপরে পা রেখে দাঁড়িয়ে, ত্রিপুরার রাজভাষা তখনো বাংলা। এ এক অবিশ্বাস্য অতীত কারণ ত্রিপুরার রাজপরিবারের যাঁরা সদস্য, তাঁদের জাতভাষা

বাংলা নয় বা তাঁরা বাঙালি নন ! যাহোক, মহারাজাদের আমল থেকেই, ঐতিহাসিক যোগসূত্রেই, বাংলার সমতল ভূমির বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ি ত্রিপুরার যে হৃদ্যতা, সেই হৃদ্যতা ক্রমশ বাড়া বৈ কমেনি। মহারাজাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনা যেমন ইতিহাস, তেমনি ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরবর্তী প্রজন্মের ত্রিপুরাবাসীর অবদানও আরেক ইতিহাস।

ত্রিপুরার মহারাজাদের সবার দলিল-দস্তাবেজ মহাফেজখানায় জমা নেই। তবে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে শুরু করে তাঁর প্রপৌত্র বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য সম্পর্কে বেশকিছু নথিপত্র আছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের আমল থেকেই ত্রিপুরার আধুনিক ইতিহাসের সূচনা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কারণ তাঁর আমল থেকেই রাজ্য পরিচালনায় শিক্ষা, সঙ্গীতচর্চা ও গুণীজনের সমাবেশ ইত্যাদি আধুনিক জীবনের লক্ষণগুলো স্থান করে নিতে শুরু করে। সেকালের কিশোর রবীন্দ্রনাথকে, যাঁর পরিচিতি তখন কেবল পরিচিতজনদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ, এই বীরচন্দ্র মাণিক্যই 'কবি' বলে স্বীকৃতিদান করেন সর্বপ্রথম। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয়সঙ্কুল ছিলো, তার সঙ্গে কোন রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহেতুক সখ্য-সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।"

শুধু তাই নয়। উপমহাদেশে বৃটিশ তাদের পৌনে দু'শ' বছরের উপনিবেশবাদী শাসনামলে যদিও সরাসরি শাসন করেনি ত্রিপুরাকে, তবুও ত্রিপুরার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে হলেও তাদের নাগপাশ বৃত্তের বাইরে ছিলো না। এরপরেও স্বাধীনতাকামী মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃটিশ-বিরোধী বাঙালি যোদ্ধাদের এককালীন আশ্রয়স্থল হতে পেরেছিলো ত্রিপুরা। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' আমলে উপমহাদেশের অনেক বাঙালি বিপ্লবী আশ্রয় পেয়েছিলেন বৃহত্তর ত্রিপুরার মাটিতে, অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে যা আরেক অধ্যায় হিসেবে গণ্য।

ত্রিপুরার মহারাজা বা তাঁদের রাজপরিবারের দীর্ঘকালের অতি-ঘনিষ্ঠজন রবীন্দ্রনাথের উল্লেখের ব্যাপারটি এ গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেটা করা হয়েছে এ কারণে যে, বাঙালি না হওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুরার মহারাজাদের হাতে বাংলা এবং বাংলাভাষা যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহেও তার বেশকিছুটা তাৎপর্য বা প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে স্পষ্টভাবেই। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন। বিলেতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান গবেষণা করবেন। তাঁর অর্থ চাই প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অর্থ সংগ্রহে মাঠে নামলেন। কিন্তু মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরুন, সেটা দেখতে চাইলেন না। তিনি কবিগুরুকে লিখলেন "এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশি বাজনাই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব।" চিঠির পরের অংশটি

সেকালের যেকোনো প্রভাবশালী মহারাজার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকিশোর লিখলেন "প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায়—আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড়ো ভিক্ষুক আছে।"

এই রাধাকিশোর মাণিক্যই সেকালে ৫০ হাজার টাকা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার কাজে দান করেছিলেন। সহায়তা করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নানা কাজে। শুধু তাই নয়, অন্ধ কবি হেমচন্দ্র এবং ডঃ দিনেশচন্দ্র সেন তাঁদের জীবনের অন্যতম সঙ্কটতম মুহূর্তে ত্রিপুরার মহারাজাদের কাছ থেকে আর্থিক মাসোহারা পেয়ে সঙ্কটমুক্ত হয়েছিলেন।

ত্রিপুরার মহারাজাদের ভেতরে অনেকেই ছিলেন বৃটিশ উপনিবেশবাদ শাসনের বিরোধী। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর সব রাজ্যের রাজাদের মতো তাঁরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। এখানে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের "হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের একটা উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে "ত্রিপুরার রাজাদের অনুগত প্রজা বা সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাহাড়ি এলাকা বিলোনিয়া ও উদয়পুরে দুটো খামার ছিলো। সেগুলো দৃশ্যত কৃষি খামার হলেও মূলত তা ছিলো প্রশিক্ষণ শিবির। দিনের বেলায় সমিতির সদস্যরা মাঠে কাজ করতো ; কিন্তু রাতের বেলা তাঁদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এবং নিকটবর্তী পাহাড়ে গিয়ে তারা গোলাগুলির মহড়া দিত।"

মহারাজা রাধাকিশোর খুব সম্ভবত বিপ্লববাদী দেশপ্রেমিকদের এসব কাজে সহযোগিতার জন্য হাত প্রসারিত করেছিলেন এবং সে কারণেই ইংরেজ সরকার তাঁর নামের আগে 'মহারাজা' উপাধি ব্যবহারে বাদ সেধেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভূমিকার ফলে, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান রাখি বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্র অনুরাগীদের অনেকে এবং অনুশীলন সমিতির সদস্যরা মিলে ১৯০৬ সালে স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমিতে 'রাখিবন্ধন উৎসব' পালন করেছিলেন। সে সময় মহারাজাদের রাজপ্রাসাদে শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিলো। ত্রিপুরার প্রবীণ সমাজতন্ত্রী নেতা বীরেন দত্তের ভাষায় "১৯০৯ সালে বৃটিশ কর্তৃক সমস্ত বিপ্লবী দলগুলোর প্রকাশ্য কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর এই শহরটিকে (আগরতলা) তাঁরা আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।"

আশি বছরের জীবনসীমার ষাট বছরই রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন ত্রিপুরার সঙ্গে। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে এসেছিলেন চার মহারাজা। বোধ করি, এই অসামান্য বদান্যতার কথা স্মরণ রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন ত্রিপুরাকে। 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' বাদেও অসংখ্য গান এবং কবিতা উপহার

দিয়েছেন তিনি আগরতলাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের গুরুত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতো বেশি গভীর হয়েছিলো যে, রাজপরিবারের নিতান্ত ব্যক্তিগত কলহেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ও বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য—এঁদের সবার সাথেই রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র ছিলো আমরণ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজারা। মহারাজা বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 'কবি'র সম্মানে ভূষিত করেছিলেন সর্বপ্রথম। তারই প্রপৌত্র বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য শেষ বয়সে কবিগুরুকে সম্মানিত করেন 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়ে আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ত্রিপুরাকে এ কারণেই আমি বাঙালির তৃতীয় ভুবন বলে থাকি। বলি এজন্যে যে, স্থানীয় উপজাতিদের ভেতরে মানবিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৈষয়িক কোন্দল অব্যাহত থাকলেও বাংলাভাষা এবং বাঙালি সত্তর ভাগের মতো স্থান অধিকার করে নিয়েছে ত্রিপুরায়। এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনীতিতে যতোটা নয়, তার চাইতে বেশি ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ফকবরকে কথা বললেও অনেক স্থানীয় উপজাতির লিখিত ভাষা বাংলা। মণিপুরীদের অনেকেই ইতিমধ্যেই বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছেন। মণিপুরের সমরজিৎ সিংহের বিশেষ ক'টি কবিতা গ্রন্থের সঙ্গে আমি নিজেই পরিচিত। রাজ পরিবারের রাতুল দেব বর্মন নিজেও একজন বাংলাভাষার কবি। এছাড়াও বাঙালি সংস্কৃতি বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বের আধিপত্য বিস্তৃত পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

কেন এমনটি হতে পারলো? ত্রিপুরার মহারাজাদের বাংলাপ্রীতির পেছনে কোন্ কারণটিই বা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিলো? ভাবিয়ে তুলেছে প্রশ্নগুলো কমবেশি আমাকেও। ইতিহাস ঘেঁটে ওগুলোর উত্তর খুঁজে দেখবার চেষ্টা করিনি খুব একটা। তবে বহু জাতি বা উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক অসুবিধেটা বরাবরই থেকে যায়—বোধ করি সেটাই দূর করতে চেয়েছিলেন মহারাজারা বাংলাকে আমদানি করে। এছাড়াও প্রাচীনকালে ত্রিপুরার মহারাজাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিলো বর্তমান বাংলাদেশের বেশকিছু অঞ্চল জুড়ে। আর সেই সূত্রেও ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অর্জিত হয়ে থাকতে পারে।

বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরাকে প্রাত্যহিক বন্ধনে আজো আবদ্ধ রেখেছে গোমতী নদী। পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা গোমতীর পরিপূর্ণ বিস্তার বাংলার সমতল ভূমিতে এসে। রাজনৈতিক কারণে তারা আজ বিভক্তির শিকার হলেও ইতিহাসে এই দুই ভূমির অনেকটুকুই এক ও অভিন্ন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমাল্য' বলে, ত্রিপুরা রাজাদের প্রথম অধিষ্ঠান ছিলো ফিরাত দেশে। প্রাচীন ফিরাত রাজ্য বাংলাদেশের অনেকাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিলো বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন।

ফিরাত দেশের নাম উল্লেখ আছে গ্রীক বণিকদের রচনায়, যারা খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীহট্ট ও চট্টলা ভূমি ছিলো এই কথিত ফিরাত রাজ্যের অন্তর্গত।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ, যিনি সপ্তম শতাব্দীতে ঘুরে গেছেন বাংলা, তিনিও এমনি একটা দেশের নামোল্লেখ করেছেন। সুদূর ইতিহাস কেনো, এই বৃটিশ আমল পর্যন্তও ত্রিপুরা যুক্ত ছিলো বাংলার সাথে। বৃহত্তর ত্রিপুরার সাথে যুক্ত ছিলো আজকের বাংলাদেশের অনেকগুলো জেলা। তাদের সংযোগ ছিলো নিয়মিত। সে সংযোগ আজ নেই। রাষ্ট্রীয় সীমানার বিভাজন রেখা ব্যবচ্ছেদ করেছে তার দেহ। কিন্তু হৃদয় ? তাও কি ভাগ করা গেছে ?

প্রেক্ষাপট

প্রাচীন 'বাংলা' এককালে ছিলো 'বঙ্গ'। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজল প্রদত্ত তথ্যে এই আভাস থাকলেও 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি নিয়ে ইতিহাসবিদদের ভেতরে বিতর্ক আছে। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' নামে দু'টি পৃথক দেশের অস্তিত্বের কথা শিলালিপিতে উল্লেখ আছে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ইতিহাসবিদের মতে, 'বঙ্গাল' দেশের নাম থেকেই 'বাংলা'র উৎপত্তি। পাল ও সেন যুগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ সুলতানী আমলে বঙ্গ 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিলো। তবে মোগল যুগ থেকে 'বাংলা' নাম তার স্থায়িত্ব লাভ করে। কারণ সম্রাট আকবরের আমলেই 'সুবা বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশবাদী ইংরেজ এসে সেই বাংলা নামকে 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করে তাদের নিজেদের ভাষায়।

প্রাচীন 'বঙ্গ', 'বাঙালী', 'বঙ্গাল' বা 'বাংলা'র সীমানা এককালে উত্তর হিমালয় থেকে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর–পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা, উত্তর–পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ, পূর্বদিকে ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টলার শৈলশ্রেণী ধরে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল–সাঁওতাল পরগনা ও ছোট নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। অন্যদিকে ছিলো বলভূম-কেওঞ্ঝর-ময়ূর ভঞ্জের শৈল ও অরণ্যময় মালভূমি।

বঙ্গের আদি অধিবাসীদের কেউ কেউ 'নিষাদ জাতি' আখ্যা দিয়েছেন। কেউ আবার বলেছেন, বাঙালিরা আদি 'অস্ট্রিক' বা 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক'। এদের পর

দ্রাবিড় ভাষাভাষী 'আলপাইন' জাতির লোকও বসবাস করেছিলো এই বঙ্গে। বৈদিক যুগের শেষভাগে এ মাটিতে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়েছিলো। ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলাদেশের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় সর্বপ্রথম। উত্তরবঙ্গ 'পুণ্ড্র' নামেও পরিচিত ছিলো। রামায়ণ ও মহাভারতেও বাংলা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই দুই মহাকাব্যে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও তাম্রলিপি ইত্যাদির নাম আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও 'বঙ্গ' ও 'সুহ্ম' এই দুই অঞ্চলের উল্লেখ দেখা যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৬-২৭ সালে আলেকজাণ্ডার আক্রমণ করেছিলেন উপমহাদেশ। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন লেখকরা ভারতবর্ষে 'গঙ্গরিডই' নামে একটি শক্তিশালী জাতির নাম উল্লেখ করেছিলেন। বোঝা যায়, এই জাতি গঙ্গা অববাহিকার মানুষ। আলেকজাণ্ডার যখন বিপাশা নদীর তীরে পৌছান, তখন 'গঙ্গারিডই' ও 'প্রাসিয়র' জাতির এক বিশাল যৌথ বাহিনীর উপস্থিতিতে তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে যান।

এসবই ইতিহাস। বাংলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেবল দেশীয় স্বৈরাচারী রাজাদের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে প্রতিটি যুগে প্রতিটি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধেও কখনো প্রত্যক্ষ কখনো–বা পরোক্ষে। এই বিশাল জনপদের মানুষ অবৈধ অধীনতাকে কখনোই গ্রহণ করেননি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন-বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। এরপরেও গেছে বিদেশীদের অনেক আসা-যাওয়া। মোগলরা শাসন করেছে বহু বছর। শেষ পর্যন্ত এসেছিলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কলকাতা আর ঢাকায় কুঠি স্থাপন করেছিলো তারা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাউদ্দৌলাকে হত্যার ভেতর দিয়ে বাংলার স্বাধীনতাকে হস্তগত করে নিয়েছিলো ইংরেজরা।

ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল অবধি দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে চলে এই বিদ্রোহ। ১৭৬৩ সালে একদল ফকির ঢাকার ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভেতর দিয়ে ইংরেজ তাদের অনুগত দেশীয় জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করে। ১৮৩৩ সালে ময়মনসিংহের শেরপুরের পার্বত্য গারো ও হাজং জাতি করম শাহ নামের জনৈক দরবেশের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে করম শাহ'র পুত্র টিপুর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০০ কৃষক শেরপুরের কাছারি আক্রমণ করে থানায় আগুন ধরিয়ে দেয় ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করে। তাঁরা এক পর্যায়ে এলাকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৬৯ সালে সন্ন্যাসীরা রংপুরে লেফটেন্যান্ট কিনের নেতৃত্বে পরিচালিত একদল ইংরেজ সেনাকে পরাস্ত করে। এই বিদ্রোহে লেফটেন্যান্ট কিন নিহত হন।

যুগে যুগেই এই বাংলা স্বাধীনতাকামী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বারংবার

পরাজয়েও তারা মাথা নত করেনি। ১৮৩১ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওহাবি বিদ্রোহের শুরু। ওহাবিরা একাধিকবার ইংরেজ সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করেছে। নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেছিলেন তিতুমীর, সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিরক্ষাব্যূহ। কিন্তু ইংরেজের আধুনিক সমরাস্ত্রের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হতে হয় ওহাবিদের। বীর তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। ওহাবিরা ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচার এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গোঁড়ামির আশ্রয় নিলেও তাদের ইংরেজ-বিরোধী চরিত্র ও সংগ্রাম ছিলো সুদৃঢ়।

বাংলার স্বাধীনতা স্পৃহা কখনো থেমে থাকেনি। ওহাবিদের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে ফরিদপুরে গড়ে ওঠে 'ফারাজি' আন্দোলন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ফারাজিরা বৃটিশের সেবাদাস জমিদারশ্রেণী ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতো। অনেকাংশে তাদের সেই আন্দোলন সফলও হয়। এই আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দুদু শাহ যোগ্য নেতৃত্ব দেন ফারাজিদের।

একটির পতনের পর আরেকটি, এমনি করেই এই বাংলায় বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত ও প্রভাবশালী দেশীয় মহল নিরপেক্ষ থাকে। অন্যদিকে বহরমপুর, ব্যারাকপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগদান করে। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। এই চট্টগ্রামেই ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্যসেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে। ১৯৭১ সালের মার্চে এই একই চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহ করেন সেনাবাহিনীর মেজর জিয়াউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. আর. চৌধুরী, মেজর রফিকুল ইসলাম, জেনারেল খালেকুজ্জামান, মেজর ভূঁইয়া প্রমুখ। এই চট্টগ্রাম থেকেই প্রথম ঘোষণা দেয়া হয় স্বাধীনতার।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও বাংলায় প্রজা বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলচাষীদের প্রতিরোধ চরমে পৌঁছে যায়। যশোর, নদীয়া ও পাবনা জেলায় এই বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে।

অনেক রূপান্তরিত হয়েছে সেদিনকার বঙ্গ। ভাগ হয়ে গেছে বঙ্গের বাঙালি, অন্তত ভৌগোলিক দিক দিয়ে। ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের শুরু। সেদিন পূর্ব বাংলাকে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। কিন্তু টেকেনি। বাঙালির দুর্ভাগ্য, যে বঙ্গ সন্তানেরা ১৯০৫ সালে 'বঙ্গ মাতার' বিভক্তি মেনে নিতে পারেননি, বঙ্গের সেই সন্তানরাই ১৯৪৭

সালে মেনে নিয়েছিলেন চিরস্থায়ী বঙ্গ বিভাজনের ঘটনাকে!

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বাংলায়। পূর্ববাংলা পরিণত হয় এর মূল কেন্দ্রভূমিতে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এই দু'টি দলে মুসলমান সদস্য না থাকলেও তাঁদের উপনিবেশবাদ-বিরোধী চরিত্র এবং সংগ্রামী চেতনা স্বাধীন ভারত সৃষ্টির আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জোরদার করে তোলে। সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পটভূমি।

১৮৮৫ সালে জন্ম হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের। এ দু'টি দলের জন্মের পর থেকে অখণ্ড ভারতে ঘটনার যোগে স্বাধীনতার সংগ্রাম ধর্মীয় সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চরমে পৌঁছে—এর সাথে যুক্ত হয় খেলাফত আন্দোলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২২ সালে গঠন করেন 'স্বরাজ্য' দল। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা হিন্দু-মুসলিম মিলন চুক্তি। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমানের রাখিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তাকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার তেমন আর একটি মানুষও বুঝি অবশিষ্ট রইল না। মানুষ মানুষকে হত্যা করলো! কী আশ্চর্য, শুধু নামের কারণে—কেউ রাম আর কেউ রহিম বলে! বাঙালি জাতির বিকাশ ও প্রগতির বিরুদ্ধে এজিদ আর অসূরের ভূমিকা যদি কেউ নিয়ে থাকে সেটা নিয়েছিলো তাদের উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। যে মানুষ মানুষকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, যে মানুষ মানুষকে ভিটে ছাড়া করে, সে মানুষের কি কোনো ধর্ম থাকে? সে মানুষ কি হিন্দু হয় ? সে মানুষ কি মুসলমান হয় ? সে কি মানুষ হতে পারে ?

পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সংগঠনগতভাবে, বলা যায়, প্রথম ঐক্যবদ্ধ করে আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' বা 'কৃষক প্রজা পার্টি', যা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৭ সালে। সে বছরেই সাধারণ নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি মুসলিম আসনে ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি' বিজয়ী হয়। তাঁর মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় চাষী ঘাতক আইন' ও 'মহাজনী আইন' পাস এবং জমিদার ও জোতদারদের কবল থেকে বাংলার চাষীদের অনেকাংশে মুক্ত করে। ১৯৩৮ সালে 'ঋণ সালিসি বোর্ড' ও ১৯৩৯ সালে 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাস করে ফজলুল হক দীর্ঘকালের শোষিত কৃষককুলকে মুক্তির আলোকবর্তিকা দেখান।

ফজলুল হক এরই মধ্যে তাঁর দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডের জন্যে 'শের-এ-বাংলা'-তে পরিণত হন। ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে লীগের যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাস হয় তারও প্রস্তাবক ছিলেন তিনি। এই প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র

গঠনের কথা বলা হয়। ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক হলেও তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ১৯৪১ সালের ১২ আগস্ট বঙ্গীয় বিধান সভায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক যে শোক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তাতে তিনি বাংলা, বাঙালি, বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মন্তব্য রাখেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। ফজলুল হক যেহেতু বাঙালি, সেহেতু এই সাহসী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিটিকেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের চক্রান্তে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।

বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেক অধ্যায় রচনা করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি নজরবন্দি অবস্থা থেকে সান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে দেশত্যাগ করেন দুঃসাহসী বীর সুভাষ। নাজি জার্মানি ও তার দোসর জাপানের সহযোগিতায় বিদেশ-বিভুঁইয়ে গঠন করেন তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। এই 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর তৎপরতা গান্ধীবাদী অহিংস রাজনীতিকে আহত করলেও সময়ের চাহিদাকে পূরণ করেছিলো এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের মনোভাব পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হতে পেরেছিলো।

বাংলা, বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনীতি ইতিমধ্যেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বাংলার সাধারণ মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা একদিকে, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবশালী কায়েমি অভিজাত শ্রেণী—নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবার। এ সময় মুসলিম লীগে প্রগতিবাদীদের নেতৃত্ব দেন আবুল হাশিম ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের মওলানা আকরাম খাঁসহ আরও অনেকে। ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসেন দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। ওই বছরেরই ৯ এপ্রিল শামসুল হকের নেতৃত্বে ঢাকার মোগলটুলিতে এক বিরোধী দলের জন্ম হয় যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'–এ। শেখ মুজিবুর রহমানও যুক্ত থাকেন এই দলটির গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে।

১৯৪৫ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলী ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে একটি 'কেবিনেট মিশন' পাঠান। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' বদলে কেবল 'একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে'র কথা বলে জিন্নাহ ও তাঁর দল বাংলার স্বাধীনতাকে পদদলিত করে। 'কেবিনেট মিশন' ভারতকে তিনটি আত্মনিয়ন্ত্রিত ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে, অন্যদিকে মুসলিম লীগ তা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ ১৯৪১ সালের ১৯ জুলাই পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিলে স্মরণকালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে কলকাতার বুকে। এ সময় ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা হস্তান্তর করতে সমুদ্র

পাড়ি দিয়ে আসেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

বৃহত্তর বাংলা গড়ারও একটা পরিকল্পনা ছিলো নেতৃবৃন্দের। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সে পরিকল্পনা এগিয়ে যায়। এক পর্যায়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো এবং গান্ধী ও জিন্নাহর প্রাথমিক আশীর্বাদও লাভ করলো। কিন্তু শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বাংলার কিছু নেতার বিরোধিতার কারণে সে প্রয়াস ব্যর্থ হলো। বাংলার কিছু নেতা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে গেলেন আর বৃহত্তর বাংলার প্রতি আস্থা রাখার ফলে সোহরাওয়ার্দী হলেন পাকিস্তানের দুশমন।

আইনত সোহরাওয়ার্দীরই হওয়া উচিত ছিলো নবগঠিত প্রদেশ পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী। কারণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়েছিলো এবং তিনিই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি বাঙালি-বিরোধী রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রে সেই গণতান্ত্রিক কাজটি হতে পারেনি। বলতে গেলে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতার শুরু সেখান থেকেই।

'৪৭-এর দেশ বিভাগের সমস্যা ও তার আগে-পরের সাম্প্রদায়িক রক্তপাত দুই বাংলার দুই সম্প্রদায়ের ভেতরে একত্রে বসবাসের পরিবেশ বিনষ্ট করে। শুরু হয় দেশত্যাগের পালা বা অধ্যায়। ভারত বা হিন্দুস্তান হয়ে যায় অলিখিত হিন্দু রাষ্ট্র আর পাকিস্তান লিখিতভাবে ইসলামিক রাষ্ট্র। নবগঠিত পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে দাবি করেন। কিন্তু সাথে সাথেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন প্রায় একযোগে এই দাবির বিরোধিতা করেন। কুমিল্লার সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩ বছর পর ১৯৭১ সালে পাক সেনাদের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। পাকিস্তানি ধর্মান্ধরা সম্ভবত তাদের শত্রুকে চিনতে ভুল করেনি।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরের ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাংলাভাষার দাবিতে দ্রুত সংগ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। পুলিশ বেপরোয়া নির্যাতন চালায়। প্রায় হাজারখানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজি গোলাম মাহবুব প্রমুখ।

দমননীতির ফলে ছাত্র বিক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ছাত্ররা দু'জন মন্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে নেন। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে এক

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। বন্দী ছাত্রনেতারা মুক্তিলাভ করেন। ১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা পরিষদ ভবন ঘেরাও করে।

নাজিমুদ্দিনের হাতে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার চারদিন পর গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন' " ... একথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে, সে রাষ্ট্রের শত্রু ।" কিন্তু প্রতিবাদ ওঠে সভাস্থল থেকেই। নব্য পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' জিন্নাহর বক্তব্য মেনে নেয়নি বাঙালি ছাত্রসমাজ। গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' যার অন্যতম নেতা হন শেখ মুজিবুর রহমান। নঈমউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত হন এই ছাত্র সংগঠনের প্রথম আহ্বায়ক।

১৯৪৮ সালের ১৩ জুলাই ঢাকার পুলিশ বাহিনী নতুন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাংলার অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের অবদানও এক্ষেত্রে স্মরণ রাখবার মতো। ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, " আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।" মজার ব্যাপার, সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিকেও তাঁর বাস্তবভিত্তিক ভাষণের জন্যে উগ্র ধর্মীয়বাদীদের প্রবল সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিলো।

বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ধর্ম–ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে একের পর এক। ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন'-এ শিক্ষাসচিব ফজলুর রহমান বাংলা ভাষায় আরবি ও উর্দু হরফ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। পরের বছর শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় আরবি হরফ পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার সুপারিশ করা হয়। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ সর্বপ্রথম আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে। শুরু হয় আন্দোলন। পাকিস্তানিরা পরবর্তীকালে বাংলাভাষাকে 'মুসলমানি' করার আরও বেশকিছু উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কিছুতেই তা সফল হয় না।

ইতিহাস গড়াতে থাকে। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।' '৫০ সালের দিকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ। ১৯৫১ সালে গঠিত হয় সংগ্রামী যুব সংগঠন 'যুবলীগ' । '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙতে থাকলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন একাধিক ছাত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকাসহ সারা বাংলা। বিক্ষোভ ঠেকাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুলি চালায় পুলিশ। '৫২–র ভাষা আন্দোলন পুরো জাতিকে এমন বিশ্বাসে দাঁড় করিয়ে দেয় যে, তারা বুঝতে পারে, ধর্মাশ্রয়ী মুসলিম লীগ নেতারা উপনিবেশবাদী কায়দায় বাঙালিকে শোষণ করতে চায়। ধর্মের বাঁধনকে তারা কেবল শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল হিসেবে বিবেচনা করে।

ভাষা আন্দোলনের ফলে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। '৪৮–এর ভাষা আন্দোলনের পর গঠিত হয় 'মুসলিম ছাত্রলীগ' আর '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর সৃষ্টি হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলিম লীগকে ঠেকাতে জন্ম হয় 'যুক্তফ্রন্ট'-এর। এর নেতৃত্ব দেন হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। এই যুক্তফ্রন্টীয় আন্দোলনের ভিত্তি ছিলো একুশ দফা, যার প্রধানতম শর্ত ছিলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী হন আবুল কাসেম ফজলুল হক। ৮২ বছর বয়স্ক এই নেতা সে বছরের ৩০ এপ্রিল কলকাতা সফরে গিয়ে তার এক বক্তৃতায় বলেন, "

বাঙালি এক অখণ্ড জাতি। তাহারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে। তাহাদের আদর্শ এক এবং জীবনধারণের প্রণালীও এক। বাংলা অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের ঊর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারে । আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশগ্রহণ করিতে হইতেছে। আশা করি ভারত কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে বুঝাইয়াছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়া আমি মনে করিতে চেষ্টা করিব।"

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর ফজলুল হকের এমন বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করে। তারপরও মহাপ্রাণ এই বাঙালি পুরুষ থেমে থাকেননি। ৪ মে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আসুন, আমরা রাজনীতি ভুলিয়া আমাদের মহান সংহতির ধারক শ্রেষ্ঠ ভাষার ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করি। বাংলার মঙ্গল, বাংলাভাষার সেবা, বাঙালি জাতির উন্নতি ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো নিয়োজিত করাই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌছিয়া আমার আর কোনো আশা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হইয়াছে, তা অপসারিত করিবার কাজ আমি যদি আরম্ভ করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই

নিজেকে ধন্য মনে করিব।"

১৯৫৫ সালের এক কাউন্সিল অধিবেশনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক হন উদীয়মান সাহসী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন, " ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানবাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক জোট হিসেবে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব করার মহান দায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে। আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে একথা ঘোষণা করতে পারি যে, দেশের সকল ধর্মের, সকল বর্ণের এবং সকল ভাষাভাষী মানুষকে একটি গণপ্রতিষ্ঠানে সমবেত করা প্রয়োজন।"

১৯৫৬ সালের নতুন পাকিস্তানি শাসনতন্ত্রে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে 'পূর্ব বাংলাকে' 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ রূপান্তর করা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ তার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। আর তখন থেকেই পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ঘনীভূত হতে থাকে। লীগ সভাপতি মৌলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ঐতিহাসিক 'আস্‌সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কথা প্রায় প্রকাশ্যেই উচ্চারণ করেন। অবশ্য সে বছরেই তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন করেন।

পরের বছর ইস্কান্দার মির্জার চক্রান্তে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। শুরু হয় প্রাসাদ রাজনীতি। একের পর এক সরকার ও নেতার বদল। পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সঙ্কট। ১৯৫৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ কক্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী। এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে গদিচ্যুত করেন এবং জারি করেন সামরিক শাসন। নিজে বনে যান 'চিফ মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর'। সেই থেকে শক্ত ভিত গেড়ে বসে পাকিস্তানের মাটিতে সামরিক শাসন। সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করা হয় মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকে।

জেনারেল আইয়ুব এরপর নিজের থেকেই ফিল্ড মার্শাল হয়ে যান। কট্টর সাম্প্রদায়িক এই সেনাপতি বাংলাভাষা ও বাঙালিকে ধ্বংস করার ফন্দিই শুধু আঁটেননি, সেই সাথে বাঙালিকে চিরদিনের মত অধীন করে রাখতে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চালাতে থাকেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ। যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবী সমাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করার প্রবণতা এই সময় প্রকটভাবে দেখা দিতে থাকে, বিশেষ করে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের তরফ থেকে। ফলে আইয়ুব খানের সামরিক

শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয় আর এ জাতীয় প্রথম বিদ্রোহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে। শের-এ-বাংলা ফজলুল হক তখন রোগ শয্যায়। তিনি পরলোক গমন করেন ওই বছরেরই ২৭ এপ্রিল তারিখে। অবসান ঘটে একটি রাজনৈতিক অধ্যায় সম্পৃক্ত কর্মবহুল জীবনের।

'৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সুসংগঠিতভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আবার চলে গুলি। শহীদের খাতায় নাম লেখা হয় আবার একাধিক ছাত্র-জনতার। সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার চেষ্টায় তৎপর হন। গড়ে তোলেন 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'। কিন্তু এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকায় চিকিৎসার জন্যে চলে যান বিদেশে। হঠাৎ খবর আসে বৈরুতের এক হোটেলে সোহরাওয়ার্দী মারা গেছেন। রহস্যজনক মৃত্যু। তারিখ, ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর।

এক নয়, একাধিক মীরজাফরের জন্ম হয়েছে বাঙালির ইতিহাসে। পুরো বৃটিশ আমল এবং তারপর পাকিস্তানের চব্বিশ বছর সময়সীমা জুড়ে। আর সেইসব ভিন্ন নামের মীরজাফর হচ্ছেন খাজা নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন, মোনায়েম খান, খান-এ-সবুর, শাহ আজিজুর রহমান, ডাঃ মালেক প্রমুখ।

আইয়ুব খান রাইফেল, বেয়নেট আর বুলেট ব্যবহার করে ক্ষমতায় আসেননি শুধু, ধর্মের জিগির তুলেও রক্তস্নাত করেছিলেন বাংলাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়া হয়েছিলো ১৯৬৪ সালের গণআন্দোলনকে বিপথগামী করতে। অবাঙালিরা, বিশেষত ভারত থেকে দেশত্যাগী বিহারিরা এই দাঙ্গায় প্রাণ নিয়েছে বাঙালির। কিন্তু অচিরেই রুখে দাঁড়িয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাংলা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও হিন্দু-বৌদ্ধদের যৌথ প্রতিরোধ দাঙ্গাকারীদের শুধু চিহ্নিতই করে তোলেনি, সেইসাথে বুমেরাংও হয়েছে সেই দাঙ্গা শাসকদের জন্যে। পল্টনে লক্ষাধিক দাঙ্গা-বিরোধী জনতার সমাবেশে ১৯৬৪ সালের ২৯ মার্চ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। এদিকে গভর্নর মোনায়েম খানের হাত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্ররা 'কনভোকেশনে' ডিগ্রির সনদ নিতে অস্বীকার করে বসে। ছাত্র আন্দোলন চরমে ওঠে। শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার ও বহিষ্কার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

এর মধ্যেই বাধে পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নামানো হয় এন.এস.এফ নামধারী ছাত্র সংগঠনের গুণ্ডবাহিনী। সরকারি গুণ্ডাদের সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বিদ্রোহী ছাত্ররা। ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় এক জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পেশ করেন তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা। এই ৬-দফা পেশের পর

থেকে নতুন উদ্যোমে শুরু হয় আওয়ামী লীগের ওপর ভয়াবহ দমন-নির্যাতন। মুজিব গ্রেফতার হন। শত শত আওয়ামী লীগ নেতা কারাবরণ করেন। বাঙালির জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ৬-দফার ভেতর দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। জেলে অবস্থান করেও মুজিব সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একচ্ছত্র অধিপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে শুরু করেন।

আসে ঐতিহাসিক ৭ জুন। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাঁচা-মরার দাবি বাংলার শ্রমিক সমাজ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ১১জন। জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় সমুজ্জ্বল দৈনিক 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কারারুদ্ধ হন। তাঁর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়। টেলিভিশন ও রেডিও থেকে বাঙালির আবহমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি আর আচার-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত প্রায় সব ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যান। বাংলা ভাষা 'সংস্কারের' অপচেষ্টায় আবারো লিপ্ত হন গভর্নর মোনায়েম খান। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন বেসামাল আইয়ুব খান গ্রামবাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবসহ বেশকিছু দেশপ্রেমিক বাঙালি সেনা এবং বেসামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে রুজু করেন ঐতিহাসিক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' । ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে মুজিব জেলে আটক। প্রায় ১১ মাস পর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বার বন্দী করে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী করে রাখা হয়। করা হয় মামলার এক নম্বর আসামী। ফেটে পড়ে সারা বাংলা। ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে তাদের ঐতিহাসিক ১১-দফা নিয়ে, বেগবান হয় শেখ মুজিবের ৬ দফা। গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, এক অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলন, গণবিস্ফোরণ—যা শুধু আইয়ুব খানকে নিঃশর্তভাবে তথাকথিত ওই মামলা তুলে নিতেই বাধ্য করে না, সেই সঙ্গে সেই 'লৌহ মানবেরও' ঘটায় পতন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কেটে পড়েন আইয়ুব খান। ইয়াহিয়া উপায়ান্তর না দেখে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই দুই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬-দফার ওপর সারা বাংলার ম্যাণ্ডেট লাভ করে। এই নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেই আওয়াজ ওঠে 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' । শেখ মুজিব এই প্রক্রিয়াতেই 'বঙ্গবন্ধু'তে রূপান্তরিত হন। প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের ভেতরে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৯৮টি। এই নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দল, যেমন মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী কোটি কোটি টাকা খরচ করেও নিশ্চিত ভরাডুবি বরণ করে।

ঐতিহাসিক এই নির্বাচনই রক্তাক্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচনা করে। ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ রমনা রেসকোর্সে পালন করে 'শপথ দিবস'। আর এইসব ঘটনার মুখে দিশেহারা পাকিস্তানি নেতা জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন। বাঙালি মীরজাফররা আবার মাঠে নামে। জাতীয় পরিষদেও যেহেতু আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেহেতু ধরেই নেয়া হয় যে, শেখ মুজিবই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু একজন বাঙালিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভাবতে যে গণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা বা সংস্কৃতি ও রুচির প্রয়োজন, সেটা ওই সময়কার পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বা ভুট্টো সাহেবের ছিলো না। তাই তারা উঠে পড়ে লাগেন গণরায় বানচালের চেষ্টায়।

ষড়যন্ত্রের সীমা ওদের যখনই চরমে পৌঁছে, তখনই টেনে আনা হয় ভারতকে। পাকিস্তানি নেতাদের এই পুরনো চিরাচরিত মানসিকতা এবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সময়ের কাঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পেরিয়ে গেলো ১৯৭০ সাল। এলো ১৯৭১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। সারা পূর্ব বাংলা তখন স্বাধীনতার জন্য উন্মুখর। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো এই ঘোষণা মেনে নিতে অস্বীকার করে হুমকি দিলেন এই বলে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো সংসদ সদস্য যেনো ঢাকায় এসে বৈঠকে যোগ না দেন। চললো শেখ মুজিবের সাথে কথাবার্তা। নানা ধরনের দরকষাকষি। কিন্তু দুঃসাহসী মুজিব ৬-দফা থেকে এক বিন্দু নড়তে রাজি হলেন না। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে চলছে তখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কী করে পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের স্পৃহাকে দমন করা যায়, কী করে বাঙালি ও তাঁদের নেতা মুজিবকে ধ্বংস করা যায় তার গূঢ়-গভীর ষড়যন্ত্র।

বাংলার একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিব তখন ধীর-স্থির। জাতীয় জীবনের এই ভয়াবহ সঙ্কটকালেও মুজিব আদর্শচ্যুত হননি। ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদিক সম্মেলনে তিনি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বলেন পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছে, তখনই এই কালো শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গণবিরোধী শক্তি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, ১৯৫৫ সালের আইন পরিষদ ভেঙে দেয়, ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করে এবং প্রতিটি গণআন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য হস্তক্ষেপ নেয়। এই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি আবার আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছে বাংলায় জাগ্রত জনতাকে, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র জনগণকে বিজয় বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিজ্ঞ হতে হবে ।"

কিন্তু এতে করেও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীদের টনক নড়ে না। ১৯৭১-এর ১ মার্চ তারিখে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক আকস্মিক বেতার ঘোষণা মারফত

৩ মার্চে ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

জ্বলে ওঠে পূর্ব বাংলা। সে এক অভাবিত দৃশ্য ! বলতে গেলে ঢাকা শহরের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি পাড়া-মহল্লা, প্রতিটি কোণ থেকে মুহূর্তকালের ভেতরে নেমে আসে সোজা রাজপথে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসি আমরা। কল-কারখানা, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সশস্ত্র পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। পথে পথে ব্যারিকেড তৈরি হতে থাকে। ২ মার্চ হরতাল পালিত হয় সারা বাংলায়। সেনাবাহিনী নামে মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতাকে দমন করতে। অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাদের গুলিবর্ষণে। কিন্তু স্বাধিকারকামী বাঙালির কাছে মৃত্যু তখন তুচ্ছ। তাদের প্রতিরোধ তখন অসম্ভব। সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের সর্বাগ্রে দুঃসাহসী ছাত্রসমাজ।

জুলফিকার আলী ভুট্টো আর ইয়াহিয়া অর্থাৎ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখন এক কাতারে শামিল। রাজনীতিবিদ আর উচ্চাভিলাষী সেনাপতিদের ভেতরে কোনোরকম ফারাক থাকে না। আলোচনার আমন্ত্রণ আসে কিন্তু শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে এই আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে বলেন "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যখন নিরস্ত্র জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে, শহীদের তাজা রক্ত যখন রাজপথে শুকিয়ে যায়নি, কতিপয় নিহত ব্যক্তির লাশ এখনও দাফন করা হয়নি, শত শত আহত ব্যক্তি যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে, ঠিক সেই সময় ঢাকায় ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে বসার জন্যে বেতার ঘোষণা মারফতে আমন্ত্রণের প্রস্তাব একটি নির্দয় তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় ।"

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ওড়ে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, যে দৃশ্য স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। পুড়িয়ে ফেলা হয় চব্বিশ বছরের দুঃশাসনের অন্যতম প্রতীক পাকিস্তানি পতাকা। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে লাখো ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হয় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' । স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন ঘোষণা দেয় রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি হবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। ইশতেহার পঠিত হলো, স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায় গ্রহণ করা হলো কর্মকৌশল। শ্লোগান উঠলো, "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর", "স্বাধীন বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।" "জয় বাংলা" ইত্যাদি।

এলো ৭ মার্চ। ঐতিহাসিক ৭ তারিখ। রমনার রেসকোর্স ময়দান পরিণত হলো জনসমুদ্রে। বিদ্রোহে ফেটে পড়া বাংলা তাকিয়ে আছে তাদের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিবের দিকে। কী নির্দেশ দেন, কী করতে বলেন তিনি, তারই প্রতীক্ষায় তারা

অধীর থরোথরো। এক সময় নেতা এলেন। বেলা তখন ৩টা ২০ মিনিট। এখনো স্পষ্ট মনে আছে। মুজিবের কণ্ঠ থেকে নিসৃত হলো ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণেই মুজিব দেশবাসীকে আমন্ত্রণ জানালেন স্বাধীনতার সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে মুক্তিবাণীর মন্ত্র বঙ্গবন্ধু সেদিন ছড়িয়ে দেন, সেই মন্ত্র বুকে আগলে রাখে সমগ্র বাংলাদেশ। যাবতীয় পাকিস্তানি প্রশাসন অচল হয়ে পড়লো। কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত সব বন্ধ হয়ে গেলো। বলতে গেলে সেদিন থেকেই আক্ষরিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে গেলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পুরো প্রশাসন চলতে থাকলো শেখ মুজিবের নির্দেশে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সব এক হয়ে গেলো। বাঙালিত্বের জয় হলো ঘোষিত।

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে ঢাকায় এলেন। ছাত্রসমাজ ও সংগ্রামী দেশবাসী বুঝলো চরম আঘাত হানার জন্যে তার এই আগমন। তলে তলে তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। ১৭ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়ার আনুষ্ঠানিক আলোচনা হলো। সেদিন মুজিবের জন্মদিন। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর জন্মদিনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কি আর মৃত্যুদিনই বা কি? এদেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোন মহিমা। যেকোন মুহূর্তে আমাদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোন নিরাপত্তাই তারা রাখেনি। জনগণ আজ মৃতপ্রায়। আমার আবার জন্মদিন কি? আমার জীবন নিবেদিত জনগণের জন্য। আমি যে তাদেরই লোক।"

১৮ মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের আনুষ্ঠানিক সমর্থন কামনা করে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার প্রতিটি পদক্ষেপই সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করছেন মুজিব, যদিও অনেকের কাছেই মনে হতো, তাঁর অজান্তেই বুঝি পরিস্থিতি এগিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রসমাজের সেই বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া ও চীনসহ বিভিন্ন দেশের প্রতি তাদের সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়ে গণহত্যা বন্ধেরও দাবি জানানো হয়।

১৯ মার্চ জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন সংগ্রামরত বাঙালিদের ওপর গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার করে। ১৯ মার্চ ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের তৃতীয় দফা আলোচনা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও জয়দেবপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনী তখন নির্বিচারে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ১৯ মার্চ আলোচনা বৈঠক থেকে বেরিয়ে জননন্দিত মুজিব বলেন, " তারা যদি মনে করে থাকেন যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যায়, তা' হলে তারা আহাম্মকের

স্বর্গে বাস করছে ... জনগণ যখন রক্ত দিতে তৈরি হয়, তখন তাঁদের দমন করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়ায় নেই।”

২০ মার্চ মৌলানা ভাসানী চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। সেদিনই ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের নেতৃত্বে ১৩০ মিনিট ধরে ও পরদিন আবার দীর্ঘক্ষণ সভা চলে। একদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দিনের পর দিন আলোচনায় ব্যস্ত রেখে, অন্যদিকে সেনা প্রশাসন তৈরি হতে থাকে চরম আঘাত হানার প্রস্তুতিমূলক কাজে। সারা দেশের মানুষ তখন অসহিষ্ণু। সবার এক দাবি এই মুহূর্তেই স্বাধীনতার পরিপূর্ণ ঘোষণা দিন শেখ মুজিব।

২০ মার্চ ইয়াহিয়া খান জেনারেল হামিদ ও জেনারেল টিক্কাকে নিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে গণহত্যার নীল নকশা তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো কড়া সামরিক প্রহরায় শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের জন্যে ঢাকায় এসে পৌঁছান। ২২ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে ৭৫ মিনিট ধরে আলোচনা হয়। সেদিন সারা বাংলার প্রতিটি ঘরে, যানবাহনে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। সে দৃশ্য অভাবিত। পতাকা ওড়ানো হয় শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের ভবনশীর্ষে। ওড়ায় ছাত্র ও যুবকর্মীরা। গঠিত হয় ঢাকায় ‘জয় বাংলা বাহিনী’। ১১-দফা আন্দোলনের নেতা তোফায়েল আহমদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন অভিবাদন গ্রহণ করেন এই বাহিনীর।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সাথে দু’ঘন্টা ধরে কথা বলেন। কিন্তু পাকিস্তানিদের বাঙালি নিধন পরিকল্পনা তখন শুধু চূড়ান্তই হয়ে যায়নি, বলতে গেলে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকার মিরপুরে, বিশেষত বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় চলতে থাকে হত্যাযজ্ঞ। একই সাথে চলতে থাকে ধর্ষণ, লুটপাট আর বাঙালিদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ। সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার, ২৪ মার্চ যশোরে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (পরবর্তীকালে বিডিআর)-এর সদর দপ্তরে ওই বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গান গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানান। ওই দিনই ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামে।

বস্তুত মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকেই বাঙালি নিধনের সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে নেমে যায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। জেনারেল ইয়াকুব খানের জায়গায় জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করে আনা হয় গণহত্যাকে কার্যকর করবার জন্যে। আলোচনা যা হয়, সেটা ছিলো শুধুই লোক দেখানো একটা ব্যাপার। পাকিস্তানের

রাজনীতিবিদ এবং সেনাপতিরা সেদিন এক সুতোয় গাঁথা পড়েছিলেন। ২৫ মার্চ আলোচনার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব সাংবাদিকদের জানান, "পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।" শোনা গেলো, ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্ট চলে গেছেন। সে রাতেই ইয়াহিয়া খান গোপনে চলে যান করাচি।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুজিব এক বিবৃতি প্রচার করলেন এই মর্মে "আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। চট্টগ্রাম থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। এসব কিছুই চলছে যখন প্রেসিডেন্ট ঢাকায় । আমি তাঁকে অবিলম্বে এরূপ সামরিক অভিযান বন্ধ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবে না।"

সেই ২৫ মার্চের মধ্যরাতেই সামগ্রিক শক্তি নিয়ে পাক সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি নগর কেন্দ্রে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সে রাতেই বন্দী করা হয় এবং পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী সহযোগে চালানো হয় বাঙালি নিধন অভিযান দেশের প্রতিটি জেলা সদরে এবং সেনানিবাসেও।

সে রাত থেকেই গড়ে উঠতে থাকে প্রতিরোধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহ করে বসে। ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন সেই সময়কার মেজর জিয়াউর রহমান। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। একদিকে জীবন বাঁচাতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে লাখ লাখ শরণার্থী, অন্যদিকে সীমান্ত ও দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠতে থাকে সশস্ত্র প্রতিরোধ।

এই প্রেক্ষাপটেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ—নিজেদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য লাখো বাঙালির হাজার বছরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের মরণপণ সংগ্রাম।

ন্যায়যুদ্ধ

রাজনৈতিক অধিকার পদদলিত করার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসও কম হৃদয় বিদারক ছিলো না। ১৯৪৭ সালের বিভক্তির পর নবসৃষ্ট পাকিস্তানি প্রভুদের চেহারা ইংরেজ ওপনিবেশবাদীদের চেয়ে

কম কুৎসিত হয়ে ফুটে ওঠেনি। মোদ্দা কথায়, ইসলামের নামে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পূর্ব পাকিস্তান হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের আরেক উপনিবেশ।

১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিলো ১০০ টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩২ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১৪২ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২২৩ টাকা। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিলো প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানে মূল ধাতব ও বৈদ্যুতিক শিল্প যেখানে ছিলো ২%, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো ৯৮%। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো ৫ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো ৯৫ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানে কাপড় শিল্প ছিলো ২২ ভাগ আর ৭৮ ভাগ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২২টি পরিবার জাতীয় শিল্পের ৬৬ ভাগ, বীমা কোম্পানির ৭৯ ভাগ এবং ব্যাঙ্কিং শিল্পের ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো।

'সোনার বাংলা শ্মশান কেন ?' এই শিরোনামে আওয়ামী লীগের সেদিনকার একটি পোস্টার নিপীড়িত বাঙালি জাতিকে চরমভাবে নাড়া দেয়। এই পোস্টারে দেখানো হয়েছিলো রাজস্ব খাতে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে ব্যয় হতো ১৫০০ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে এর পরিমাণ ছিলো ৫০০০ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো ৩০০০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের ২০ ভাগ খরচ হতো পূর্ব পাকিস্তানে, আর ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে শতকরা ১৫জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের, বাকি ৮৪জন পশ্চিম পাকিস্তানের। সামরিক বিভাগে ১০জন পূর্ব পাকিস্তানের, ৯০জন পশ্চিম পাকিস্তানের।

ধর্মের বাঁধন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও অসামরিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ঘৃণা ও ক্রোধ বৃদ্ধির যথোপযুক্ত কারণ ছিলো। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক নিয়োগে ৮৫ ভাগ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের, ১৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের। সেনাবাহিনীতে জেনারেল পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ছিলো ১৬জন, পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র ১জন। নৌবাহিনীতে বাঙালি ছিলো শতকরা ৯ ভাগ, বিমান বাহিনীতে ১১ ভাগ, পাকিস্তান এয়ারলাইন্স্-এ বাঙালি ২৮০ আর পশ্চিম পাকিস্তানের ৭০০০।

অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলায় সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের অধিকারী ছিলো। ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যার দিক দিয়ে সারা পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ ভাগ লোক কথা বলতো বাংলায়। অন্যদিকে অন্যান্য ভাষাভাষী জনসংখ্যার হারটা ছিলো এ-রকমের : পাঞ্জাবি ২৮.৪ ভাগ, উর্দু ৭.২ ভাগ, সিন্ধি ৫.৮ ভাগ, পশতু ৭.১ ভাগ এবং ইংরেজি ১.৮ ভাগ।

শোষণ আর বঞ্চনার প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে শাসক আর শোষক-বিরোধী গণআন্দোলন। এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের ক্রমাগত শোষণ থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা করা। এ-প্রসঙ্গেই একটা কথা আগামী প্রজন্মের জানা দরকার। সেটা হচ্ছে, পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসংখ্যা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও শোষক আর শোষিত এই দুটো শ্রেণী তৈরি হয়েছিলো এবং ধর্মের দোহাই দিয়েই এই বঞ্চনা এবং শোষণকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিলো অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষদিন পর্যন্ত। কিন্তু ধর্ম কি কেবল শোষকদের স্বার্থে ? না, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের হাতে ধর্ম চিরকালই অধর্মের চেহারা নিয়ে হাজির হয়। পাকিস্তানের ২৩ বা ২৪ বছর জুড়ে ছিলো সেই অধর্মেরই বেসাতি।

সামাজিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শোষণও চালিয়েছিলো পাকিস্তানিরা অব্যাহতভাবে। চেষ্টা করেছিলো তারা বাঙালি সংস্কৃতিকে ধর্মীয়করণের। ভাষাকে ধ্বংস করারও চালিয়েছিলো অপচেষ্টা। অব্যাহত সামরিক শাসনের ফলে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে পারেনি কখনো। এরপরেও, দু' চারবার গণতন্ত্র ও নির্বাচনের যে চেষ্টা হয়নি, তা নয়। কিন্তু বাঙালি রাজনীতিবিদদের হাতে তারা ক্ষমতা ছেড়ে দেয়নি। শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মত দেশবরেণ্য নেতাকেও তারা কখনো যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি।

বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুস্থ মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোতো দূরের কথা, সহানুভূতি পর্যন্ত দেখায়নি পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বা গোর্কি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে আঘাত করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলো—সেদিনও টনক নড়েনি ওদের। পাকিস্তানি সামরিক এবং কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ভাষায় বাঙালিরা কখনো 'খাঁটি মুসলমান' ছিলো না। অতএব, ওদের 'মুসলমান' -এ পরিণত করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে তারা ব্যবহার করেছিলো বুলেট, বেয়নেট, কামান আর বন্দুক—বাঙালির রক্ত দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলো ওরা তাদের মুসলমানিত্বকে। কিন্তু বাঙালির সৌভাগ্য, তাদের সে চেষ্টা সফল হতে পারেনি

চৌদ্দ লক্ষ শরণার্থী

শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্তের বিপ্লবী রাজনৈতিক সুপরিচিতির সাথে আর একটি পরিচিতি যোগ হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে বরণীয় করে তুলতে যে ক'জন বাংলাপ্রেমী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীদাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। এঁদের ক'জনের উদ্যোগেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপন কমিটি গড়ে উঠেছিলো কলকাতায় অনেক আগে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়সীমায় পান্নালাল বাবুর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এদের কয়েকটিতে তিনি ত্রিপুরাকে নিয়ে গুরুতর শঙ্কা প্রকাশ করেন, কারণ, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে গ্রাস করার সামরিক সুযোগ ছিলো পাকিস্তানিদের। "ত্রিপুরা রাজ্যটি পাকিস্তানের ভেতরে একটা প্রতিকূল সশস্ত্র গোঁজ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকার রেল ও রোডের যাতায়াত পথ ত্রিপুরায় অবস্থিত ভারতীয় কামানের পাল্লার মধ্যে। আবার পূর্ববাংলার অনেকগুলো শহর ত্রিপুরার ঘাঁটিগুলোর আক্রমণের মধ্যে অবস্থিত। মুক্তিফৌজরাও ত্রিপুরার ঘাঁটিগুলোকে অবাধ আক্রমণের কাজে ব্যবহার করতে পারছেন। অথচ ত্রিপুরার তিনদিকেই পাকিস্তান।"

ঢাকায় ২৫ মার্চের বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু হবার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে দৌড়ে, পায়ে হেঁটে, ছুটে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে থাকে। ২৫ মার্চের রাত থেকে পরবর্তী মাসগুলোতে পাকবাহিনীর গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিলো একটিই। তারা চেয়েছিলো বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে বুলেট আর বেয়নেটের আঘাতে চিরকালের জন্যে ধূলিসাৎ করে দিতে। এব্যাপারে প্রকাশ্যে বলতে পাকিস্তানিদের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা শঙ্কাও ছিলো না বিন্দুমাত্র। "পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা চিরতরে অপসারণ করতে চাই আমরা। এর জন্যে যদি দুই মিলিয়ন লোককে হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটিকে যদি ৩০ বছরের জন্যে উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে হয়, তবুও।" গণহত্যায় নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষরা এমন কথা নির্লজ্জের মতোই বলতেন এবং পশ্চিমা সংবাদপত্রের পাতায় এ জাতীয় বিবৃতি-ভাষ্য আজও সাক্ষী হয়ে আছে।

ঢাকা শহরের শত শত ঘরবাড়ি সৈন্যরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো। রাইফেল, কামান, মেশিনগানের শব্দে কাঁপিয়ে তুলেছিলো প্রতিটি জেলা শহর। ফলে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিলো শব আর বারুদের গন্ধে। আর এই পরিস্থিতিতে হিড়িক লাগে দেশত্যাগের। রাজধানী ঢাকা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলার

মানুষের জন্যে ত্রিপুরা হয়ে ওঠে মুখ্য আশ্রয় ঘাঁটি।

পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমান্ত দীর্ঘ বলে শরণার্থীর চাপ পড়ে সেখানটাতেই প্রবল; কিন্তু ক্ষুদ্র ত্রিপুরা তার সীমিত ভূখণ্ড আর আর্থিক সামর্থ্যের ভেতরেও সাদরে গ্রহণ করে লাখো লাখো বাঙালি দেশত্যাগীকে। ধর্মের দোহাই ও সাতচল্লিশের বঙ্গ বিভক্তি প্রায় তেতাল্লিশ লাখ লোককে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলো। সেই ধর্মের দোহাই আর বর্বরতা মাত্র দুই যুগের ব্যবধানে ঘরছাড়া করলো আবার প্রায় এক কোটি মানুষকে।

১৯৭১ সালের ভারতীয় জনগণনার হিসেব বেরোয় এপ্রিলে। সেই গণনা মতে, ত্রিপুরা রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ১৫৫৬৮২২। স্বভাবতই রাজ্যের অন্য শহরগুলোর তুলনায় আগরতলার জনসংখ্যা ছিলো বেশি। অবশ্য সরকারি হিসেবে আগরতলার জনসংখ্যা ছিলো ৫৯৬৮২, ধর্মনগরে ১৬৮৬২, উদয়পুরে ১৩৯২৫, বিলোনিয়া ১১৩৭৪, কৈলাসশহরে ১০৫৯৪ ও খোয়াইয়ে ৯৩৩৮। কিন্তু মার্চ-এপ্রিলে বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রথম ধাক্কাতেই শহরাঞ্চলের এই জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শত শত শিবির বাদ দিলেও একমাত্র শহরাঞ্চলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, সেটা সেই সময়কার রাজ্য সরকারকে চরম সঙ্কটে ফেলে।

রাজ্যে তখন ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী সরকার। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভারত সরকার এই পরিস্থিতি বুঝে নিতে স্বভাবতই সময় নেন। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে চিরশত্রু পাকিস্তানের সাথে সংঘর্ষ তখন অত্যাসন্ন। সেখানে নির্বিচার গণহত্যা, নিরস্ত্র জনতার ওপর বর্বরোচিত সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি তাঁর গণতান্ত্রিক ও মানবিক বিশ্বাস থেকেই বলেছেন, গণহত্যা বন্ধ এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কিন্তু ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা, আসাম ও মেঘালয় সীমান্তে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে নিয়ে যে আকস্মিক সমস্যা উপস্থিত তা নিরসনে প্রয়োজন ছিলো সময়ের।

কিন্তু হাতে সময় নেই শচীন্দ্রলাল সিংহের। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন প্রবেশ করছে সাংখু, ধর্মতলা, বিলোনিয়া, আগরতলা, কৈলাসশহর, কসবা ও সোনামুড়া দিয়ে। উন্মুক্ত সীমান্ত। এদের জন্যে চাই খাদ্য, চাই বস্ত্র, চাই আশ্রয়। কোথা থেকে আসবে এই বিপুল যোগান ! ২৫ এপ্রিল আগরতলার সাপ্তাহিক 'সমাচার' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার এক খবর থেকে এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝা যায়। খবরটি ছিলো এ-রকমের "মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ শনিবার এখানে বলেন যে, পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমা হানাদার ফৌজের বর্বরোচিত অত্যাচারে

প্রায় এক লক্ষাধিক নরনারী এযাবৎ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। এই সমস্ত শরণার্থীর মধ্যে অন্তত প্রায় ৬০ হাজার নর-নারী সরকারি হিসেবের খাতায় নাম লিখিয়েছে। বাকি ৪০ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু এ-রাজ্যে তাদের নিকট বা দূর আত্মীয়স্বজন অথবা পরিচিত মানুষের বাড়িতে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে।

"এমনকি শহর অঞ্চলেও এমন বাড়ির সংখ্যা খুব কম যেসব বাড়িতে কিছু-না-কিছুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসেনি। সাধারণত (অবিভক্ত) কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং নোয়াখালী জেলা থেকেই অধিক সংখ্যক শরণার্থী এ-রাজ্যে এসেছে। রাজ্যের প্রায় সাত শ' মাইল সীমান্তের প্রায় প্রতিটি অংশ জুড়েই রোজ হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় এ-রাজ্যে এসে ঢুকছে।"

ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী পুনর্বাসন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতায় শচীন্দ্র সিংহের সরকারি ও ব্যক্তিগত অবদান ইতিহাসের অংশ স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বার কয়েক জরুরি বৈঠক বসে মন্ত্রিসভার। কেন্দ্রের কাছে জরুরি বার্তা যায় শরণার্থীদের জন্যে আশু সাহায্যের আবেদন জানিয়েই শুধু নয়, শচীন বাবুর মন্ত্রিসভা শরণার্থী সমস্যাকে 'জাতীয় সমস্যা' হিসেবে বিবেচনা করতে কেন্দ্রের কাছে জোর সুপারিশও করেন। উল্লেখযোগ্য, এপ্রিলের প্রথম দিকে ত্রিপুরায় কোনোরকম শরণার্থী শিবির স্থাপিত হয়নি। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই বিপুলসংখ্যক দেশত্যাগী মানুষকে জায়গা দেয়া হয়েছিলো। বাকিরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা গাছতলায় নিয়েছিলো আশ্রয়।

এপ্রিল মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারত সীমান্তের সবক'টি জায়গায় অবস্থান সুদৃঢ় করে ফেলে। দেশত্যাগী হাজার হাজার পলাতক নারী-পুরুষকে তারা পথে-ঘাটে বুলেট-বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে। যুবতী মেয়েদের লাঞ্ছিত করে, শত শত মেয়েকে ধরে নিয়ে ওদের বাঙ্কার ও আশ্রয়স্থলে বন্দী করে পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাকবাহিনীর সেই তাণ্ডব বিশ্ব-ইতিহাসের নির্লজ্জতম নজির।

এপ্রিলের শেষদিক থেকে ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর গড়ে ওঠে একের পর এক শরণার্থী শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র সিংহের সরকার কেন্দ্রের ইঙ্গিতে সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর সরকারই শুধু নয়, সেই সাথে এগিয়ে আসে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ। অনেক স্কুল–কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরার ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একযোগে শরণার্থীদের হাতে হাত ধরে মাঠে নামেন। কেউ সংগ্রহ করেন অর্থ, কেউ কাপড়-চোপড়, কেউ শিবিরগুলোর দেখাশোনা করেন। আর এসব কিছুর পেছনে যে তাড়নাটি বড়োভাবে কাজ করেছিলো, সেটা ছিলো বাঙালিত্ব, যেখানে ধর্ম কোনো রকম বাদ সাধেনি, মসজিদ বা মন্দির কোনো

সমস্যা তৈরি করেনি। সঙ্কট ও বিপদ-বিপন্নতায় জর্জরিত মানুষেরই অঙ্গীভূত অংশ হয়ে যান তাঁরা। কার হৃদয় জুড়ে আল্লাহ আর কার হৃদয় জুড়ে ভগবান—এ-নিয়ে কেউ কাউকে কোনো প্রশ্ন করেনি। সময়ের দাবি মানুষকে করে তোলে এতোটাই মানবিক !

শচীন্দ্র সিংহের কথা বারবার উল্লেখ করতে হয় এ কারণে যে, এই সাহসী রাজনীতিবিদের অবদান শুধু শরণার্থী পুনর্বাসনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আগরতলাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানীতে পরিণত করতেও তার ভূমিকা প্রভূত সাহায্য করেছে। ২১ মে লম্বুছড়ার এক শরণার্থী শিবির দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "পূর্ব বাংলার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলন। পৃথিবীর কোন স্বৈরশক্তি এই আন্দোলন দমন করতে পারবে না। এ আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই।"

ত্রিপুরা সরকারের প্রচার অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দ তাঁদের একদিনের বেতনের টাকা দিয়ে লম্বুছড়া শিবিরের ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড় দান করেন। রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ শচীন বাবু শরণার্থীদের মনোবল শক্ত করতে সেদিন আরো বলেছিলেন "আপনারা স্বাধীনতার আন্দোলন করছেন। আপনারা জয়যুক্ত হবেনই। আমরা জানি, যাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলন করেন তাঁরা অনেকেই স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন না। বঙ্গবন্ধু মুজিব যে আন্দোলন শুরু করেছেন পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনে তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যাতে আপনারা অতি শীঘ্র পূর্ববাংলায় গিয়ে বসবাস করতে পারেন সে অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।"

সে সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অন্য আর যারা প্রভূত ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব আই. পি. গুপ্ত অন্যতম। আই. পি. গুপ্ত কেবল তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সাথে মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে সর্বতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বতোভাবে। এছাড়াও ছিলেন ওমেস সাইগল, শচ্চীদানন্দ ব্যানার্জি, প্রমোদ আচার্জি, সুবোধ সেন এবং জীতেন্দ্র সেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সে সময়কার প্রতিটি কর্মকর্তা, কর্মচারি, যাঁদের অধিকাংশের নাম আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, গভীরভাবে জড়িত ছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজে।

ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। তার রাজধানী ক্ষুদ্রায়তনের আগরতলা। ১৯৭১ সালে আজকের মতো সেখানে প্রসার হয়নি। পত্রপত্রিকার সংখ্যা ছিলো না এতো বেশি। তবু অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করেছি, মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকেই আগরতলার প্রতিটি সাপ্তাহিক এবং দৈনিকের প্রায় প্রতিটি পাতা ঠাসা থাকতো পূর্ববাংলার শরণার্থী, পাকিস্তানিদের বর্বরতা আর মুক্তিসংগ্রামীদের যুদ্ধ তৎপরতার খবরে। সে সময়কার টেবলয়েড সাইজের 'দৈনিক সংবাদ' এবং সাপ্তাহিক 'সমাচার' মার্চ-

এপ্রিল মাস থেকেই পরিণত হয়েছিলো যেনো বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সংবাদপত্রে। এ-ছাড়াও ছিলো 'জাগরণ' এবং 'দেশের কথা' ইত্যাদি সাপ্তাহিক।

'সাপ্তাহিক সমাচার'-এর সম্পাদক শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচার্য তাঁর কাগজে শুধু খবর ছাপিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সাথে প্রায় প্রতিদিন লিখেছেন সম্পাদকীয়। ১৮ এপ্রিল "যে পতাকা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল" শিরোনামে 'সমাচার"-এর যে সম্পাদকীয় বেরিয়েছিলো তার কিয়দংশ ছিলো এই রকমের "গোটা 'বাংলাদেশে' স্বদেশপ্রেমী মুক্তিফৌজ এক অবিস্মরণীয় বীরত্বে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। হানাদার শত্রু সৈন্যের নির্বিচার গোলাবর্ষণের মুহুর্মুহু শব্দে এই শহরের ঘরবাড়ি কাঁপছে। তিতাসের দুই তীর জুড়ে এখন যে সংঘর্ষ তীব্র, এই শহরের আট কিলোমিটার দূরবর্তী সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত সেই সংঘর্ষের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র স্থলপথটাকে অধিকারে আনবার পক্ষে আগরতলা শহরের অদূরবর্তী আখাউড়া রেলওয়ে জংশনটির দখলের গুরুত্ব অপরিহার্য। যতদূর সংবাদ, মুক্তিফৌজের উদ্যত কামানের বিরামহীন অগ্নি-উদ্‌গিরণের ফলে শত্রু বিমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশ থেকে বিস্তর চেষ্টা করেও অভিপ্রেত স্থানে বোমাবর্ষণ করতে পারছে না। ... একদিকে যখন বাংলাদেশ জুড়ে নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন নারকীয় পৈশাচিকতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়ে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে মাইলের পর মাইল বাংলার সবুজ ধানের ক্ষেত ধ্বংস করে দিচ্ছে। স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলাই এই বিরাট শয়তানি চক্রান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য ।"

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনী যখন ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরের ওপরেও অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বলতে গেলে সেই মুহূর্তটি থেকেই আগরতলার 'দৈনিক সংবাদ' মুক্তি সংগ্রামের মুখ্য মুখপত্র হয়ে ওঠে। ব্যানার হেডলাইনে শ্রী ভূপেন দত্ত ভৌমিক সম্পাদিত এই কাগজ ২৮ মার্চ লিখছে "বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে শত্রু সৈন্যদের পরাভূত করে এগিয়ে চলেছে বলে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের" সর্বশেষ সংবাদে (ভারতীয় সময় রাত ১.৫ মিনিট) জানা গেছে। চট্টগ্রাম ছাড়া রংপুর, কুমিল্লা, যশোরও মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য মিহির দে নামের একজন অধ্যাপক রেডিও মনিটরের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করার ফলে অত্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে "স্বাধীন বাংলা বেতার"-এর প্রাথমিককালের খবরাখবরগুলোও আগরতলা থেকে পরিপূর্ণভাবে ধরা যেতো। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক মিহির দে'র উদ্ভাবিত এই কৌশলের ফলে গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি রণপ্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়তো।

মার্চের শেষ সপ্তাহেই আগরতলাসহ ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার সহায়ক একাধিক কমিটি। ২৮ মার্চ এমনি একটি কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন যথাক্রমে শ্রী সজল লস্কর, রাখালরাজ দত্ত ও অনিরুদ্ধ দে। এইদিন ত্রিপুরার শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গণতান্ত্রিক সংস্থা ও ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে যৌথ ও একক বিবৃতিতে 'আকাশবাণী' থেকে বাংলার মুক্তি সংগ্রামের খবর আরো গুরুত্ব সহকারে প্রচারের দাবি জানানো হয়।

মার্চের শেষদিক থেকেই পাকিস্তানি সেনাপতিরা সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সীমান্ত রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। অনেকাংশে সফলও হয় তারা ; কিন্তু দুই পাড়েই যেখানে একই ভাষাভাষী, একই চেহারা আর দৈহিক কাঠামোর মানুষ, সেখানে কি করে সম্ভব এই বিস্তীর্ণ খোলামেলা সীমান্ত বন্ধ করা ? অতএব, দেশত্যাগী মানুষের স্রোত ঠেকানো যায়নি। ত্রিপুরার কণ্ঠ-উপকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশের মানুষে। এই দেশত্যাগীদের অনেকেরই আপনজনের খোঁজ নেই—স্বামী জানে না তাঁর স্ত্রী-সন্তান কোথায়, যুবতী মেয়ে জানে না কোথায় গেলে পাবে সে তার কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা, কোথায় হবে তার ঠিকানা, কোথায় মিলবে আশ্রয়—পরিস্থিতি ছিলো এমনিই নিদারুণ।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সীমান্ত রাজধানীগুলোর মধ্যে একমাত্র আগরতলাই বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন। আর এই ভৌগোলিক যোগসূত্রের কারণেও আগরতলা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মুখ্য বন্ধুর ভূমিকা রাখতে পেরেছিলো। তৎকালীন এম.পি. শ্রী দশরথ দেব এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ত্যাগী সমাজবাদী নেতা নৃপেণ চক্রবর্তী ১৯ এপ্রিল ত্রিপুরা জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করে বাংলাদেশ থেকে আগত নির্যাতিত জনগণের পাকিস্তানি মুদ্রা বিনিময়ের চরম দুর্ভোগজনিত সমস্যা, যানবাহন ও আশ্রয় শিবিরের অভাব ইত্যাদি সমস্যার সমাধান বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আর্কষণে যারপরনাই উদ্যোগ নেন। শরণার্থীদের তখন অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি একটা বড়ো সমস্যা ছিলো এই মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যা। কংগ্রেস ক্ষমতাশীল থাকায় সরকারি পর্যায়ে এভাবে জড়িয়ে পড়া ওদের পক্ষে যতোখানি সহজ হয়েছিলো, সিপিএম (এসএল)-এর পক্ষে ততোখানি সম্ভব হয়নি। তবে শরণার্থীদের জন্যে উৎকণ্ঠা এবং মুক্তি সংগ্রামে সহায়তার ব্যাপারে মনের আবেগ কারও বিন্দুমাত্র কম ছিলো বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভারত এবং এর জনগণতো বটেই, একমাত্র গণচীন ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তাদের জনগণ অকাতরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে (দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ২১ এপ্রিল, ১৯৭১) বলেছিলো—শেখ মুজিবরের

নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের "একমাত্র সাংবিধানিক বৈধ সরকার", কেননা বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এর আগে ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিলো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। সরকার গঠনের পর থেকেই মুক্তি সংগ্রামের কাঠামোগত বিন্যাস তৈরি হয়ে যায় এবং বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, ইয়ুথ ক্যাম্প এবং গেরিলা ক্যাম্পগুলো তদারকির ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং এম.এন.এ ও এম.পি'দের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও ত্রিপুরাবাসীদের সহযোগিতা থেমে থাকেনি। দুর্ভোগপীড়িত শরণার্থীদের সাহায্যে দৈহিক ও মানসিকভাবে এগিয়ে আসার পাশাপাশি ভারত সরকার যাতে নতুন বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি প্রদান করে তার জন্যেও তাঁরা প্রবল চাপ প্রয়োগ করেন কেন্দ্রের ওপর। ২ এপ্রিল, অস্থায়ী সরকার গঠনের অনেক আগেই, পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে ও 'স্বাধীন বাংলাকে' স্বীকৃতিদানের দাবিতে সারা ত্রিপুরায় স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ পালিত হয়। বন্‌ধের ডাক দেয় বিভিন্ন ছাত্র ও গণসংগঠন। এপ্রিলে বাংলাদেশের 'নতুন কর্তৃত্বের' প্রতি ভারত সরকারের স্বীকৃতি আদায়ে ত্রিপুরার বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এক বিরাট মিছিলসহ আগরতলা প্রদক্ষিণ করেন।

বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মতো দেশত্যাগী মানুষ যখন ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে প্রবেশ করছে তখন একদিকে চলছে শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজ অন্যদিকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ আর ট্রেনিং দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুক্তিকামী হাজার হাজার তরুণ-যুবকের সমন্বয়ে মুক্তিফৌজ গড়ে তোলার কাজ। এই সময় ত্রিপুরা অঞ্চলের যুব অভ্যর্থনা শিবিরগুলোর দায়িত্ব আওয়ামী লীগের এম.এন.এ ও এম.পি'দের ভেতরে ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো। যেমন বেলুনিয়ার দায়িত্বে ছিলেন শহিদউদ্দিন ইস্কান্দার এম.পি.এ, বেলতলীতে শ্রমিক নেতা আবদুর রহমান, ছোট খোলায় ছাত্রলীগ নেতা সিরাজউদ্দিন ও আবদুল কুদ্দুস, রাজানগরে খাজা আহম্মদ এম.এন.এ ও তালেব আলী এম.পি.এ, পানাতোলায় বিসমিল্লাহ মিয়া ও মোহাম্মদ হানিফ এম.পি.এ, কাঁঠালিয়ায় জালালউদ্দিন এম.পি.এ, শ্রীনগরে ক্যাপ্টেন (অবঃ) সুজাত আলী এম.এন.এ, মেলাঘরে রাজা মিয়া এম.পি.এ ও এ, হাকিম এম.পি.এ, হরিণায় প্রফেসর খোরশেদ আলম এম.এন.এ, নরসিঙ্গড়-এ হান্নান এ.এম.এ, এম.এ মান্নান এম.পি.এ ও খায়েরউদ্দিন এম.পি.এ, মোহনপুরে দেওয়ান আবদুল আব্বাস এম.পি.এ ও গোকুল নগরে সফিরউদ্দিন এম.পি.এ।

এপ্রিলের ১৭ তারিখের মধ্যে সমগ্র ত্রিপুরায় রাজ্য সরকার ১৯টি আশ্রয় শিবির খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন শরণার্থীদের জায়াগা করে দিতে। এগুলোর একেকটিতে

ঠাঁই নিয়েছিলো হাজার হাজার নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ভারতের সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে চিরস্মরণীয়। শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে তিনি বেশ কয়েকবার এসেছিলেন আগরতলায়। ১৫ মে আগরতলা বিমানবন্দরে নেমে তিনি দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, " আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করে নিজেদের দেশ গড়ে তুলবে, আমরা পরস্পর পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করবো কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ প্রতারিত হয়েছে, মানবতা সেখানে লাঞ্ছিত হয়েছে। আজ সেখানে যে মুক্তির সংগ্রাম চলছে তাকে নষ্ট করার জন্য পাক সামরিক শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে সামাজিক ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা চলছে। বিভেদ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে দু'দেশের জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে প্রতিরোধ করতে হবে।" (দৈনিক সংবাদ, ১৬ মে)

শ্রীমতী ইন্দিরা পরেরবার এলে সাংবাদিকরা তাঁকে আরও নানাবিধ প্রশ্ন করেছিলেন। সেবার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি এখানে নতুন কিছু জানতে আসিনি। নয়াদিল্লী থেকেই আমি সব খবর পাচ্ছি। আমি এসেছি এই অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষদের সহানুভূতি জানাতে।"

১৬ জুলাই ত্রিপুরার উপমন্ত্রী মনসুর আলী বিনোনিয়ার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৪ জুলাই বাংলদেশ শরণার্থী ত্রাণ মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে গভর্নরের পত্নী শ্রীমতী ডায়াস বড়োজোলার কাছে কাঁঠালতলী শিবিরে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে নিজেদের সংগৃহীত বস্ত্র বিতরণ করেন। জুলাই মাসের ভেতরে সারা ভারতে ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার শরণার্থী ঢুকে পড়ে। সংখ্যার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ে সিংহভাগ মানুষ, তারপরের স্থান ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের। বিপ্লবী সরকার ও ভারতীয় তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, এপ্রিল মাসে গড়ে প্রতিদিন ৫৬ হাজার মানুষ ভারতের মাটিতে পা রেখেছিল।

রাজ্য সরকারের দেয়া আগস্ট মাসের এক হিসেবে ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিলো নিম্নরূপ

স্থায়ী লোকসংখ্যা —	১৫৫৯০০০ জন
আগত শরণার্থী —	১২২১০৭৫৪ জন
শিবির সংখ্যা —	৩৬টি
ইউনিট —	৩৮২টি
শিবিরবাসী —	৬৯২১৫৪ জন
ব্যক্তিগত ব্যবস্থা —	১৫০০০০ জন

আত্মীয়ের সঙ্গে — ৩৮৯৬০০ জন
রাজ্যের বাইরে প্রেরিত — ২৫৪৪০ জন
সংরক্ষিত ব্যবস্থা — ৭৫০০০ জন
এ পর্যন্ত ব্যয় — ৭২০০০০০০ টাকা
সম্ভাব্য ব্যয় —৪৫ কোটি টাকা
চিকিৎসা —৩৫০ জন ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মী

সূত্র রাজ্য সরকারের নথিপত্র ও তৎকালীন খবরের কাগজ

এই হিসেবের আওতায় সরকারের আরো যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছিলো, সেগুলোর ভেতরে ছিলো ত্রাণকার্য পরিচালনায় তাদের প্রয়োজনীয় গাড়ি ও পরিবহন ব্যবস্থার নিদারুণ অভাব, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা। পত্রপত্রিকার অভিযোগ থেকে দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রাণকর্মীদের মধ্যে অনভিজ্ঞতা, অতিরিক্ত চাপ, ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তরায় ও শরণার্থীদের স্থানান্তর গমনে অনিচ্ছাজনিত সমস্যা ও মনোভাব। আরো একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, ওই সময় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর হার ছিলো ৫১.৮৮, ত্রিপুরায় ১০.৬৮, মেঘালয়ে ২,৭৯ আর আসামে ২.২০ভাগ। তবুও সবকিছু মিলিয়ে ত্রিপুরায় শরণার্থীদের জন্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো, সেটা যে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভালো ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় লোকসভার সদস্যবৃন্দ এবং জাতিসংঘ ত্রাণ দফতরের পর্যবেক্ষকবৃন্দ বেশ কয়েকবারই এই মন্তব্য করেছেন। জুলাই পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় যতো শরণার্থী এসেছিলেন তার ভেতরে ৩৬ লক্ষ ছিলেন পুরুষ ও ৩১.৬৩ লক্ষ ছিলেন নারী। শিবির বা অভ্যর্থনা কেন্দ্র খোলা হয়েছিলো ১১৫০টি। বিভিন্ন শিবিরে আট বছরের শিশুর সংখ্যা ছিলো ১১.৩৫ লক্ষ। *[সূত্র সরকারি নথিপত্র]*

নভেম্বর মাস নাগাদ ত্রিপুরার মোট স্থায়ী জনসংখ্যার প্রায় সমানসংখ্যক মানুষ যখন বাংলাদেশ থেকে এসে উপস্থিত হয় সেখানে পশ্চিম বাংলায় তখন এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৬৬৮১ জন, আসামের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত পূর্ববাংলা সংলগ্ন অঞ্চলে ২০৪৯০৯ জন, মেঘালয়ে ৫৭৩৬৩০ জন এবং সুদূর বিহারে ৯২৮২ জন। এই হিসেব সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিবিরগুলোর। এছাড়াও বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে পশ্চিমবাংলায় ঠাঁই নিয়েছিলো আরও ২২৬২৬৮১ জন, আসামে ৮৬১৮৪ জন ও মেঘালয়ে ৭৩৩৩৫ জন। নভেম্বর নাগাদ ত্রিপুরার শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলো ৮৮০৩১৬ জন এবং বন্ধু-আত্মীয়স্বজনের কাছে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিলো আরও ৫২৭১০০ জন—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা যেখানে ১৫৫৬৮২২ জন, সেখানে মোট শরণার্থীর সংখ্যাই দাঁড়িয়েছিলো ১৪৭৪১৬ জন। সেটা ছিলো সত্যিকার ভাবেই একটা অস্বাভাবিক চাপ, যাকে বহন করার দৈহিক সঙ্গতি না থাকলেও হৃদয়ের সার্বিক উত্তাপ আর ভালোবাসা দিয়ে

ত্রিপুরাবাসী তা সামলে ছিলেন।

শরণার্থীদের এই রকম জোয়ারের মুখে ত্রিপুরায় খাদ্যদ্রব্য আর ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দেয় মাত্রাতিরিক্তভাবে। ডিমের হালি তিন টাকা থেকে বারো টাকায় দাঁড়ায়। শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় কিছু সুযোগসন্ধানী লোক যে রাতারাতি ধনী হয়ে যাননি, তাও নয়। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ হঠাৎ করেই এক বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সেই সময় সমস্যাটির প্রতি রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে 'দৈনিক সংবাদ'-এর দুঃসাহসী সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিকের একটি সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছিলো, তা উল্লেখের দাবিদার। ৪ মে সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন " একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাংলাদেশের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আরো দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশের যুদ্ধের আগুনে আমরা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছি, পাক সরকার ও তার সাগরেদ সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুরা যতই এটাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করুক না কেন। আমরা সামগ্রিকভাবে ভারতের কথা উল্লেখ না করে ত্রিপুরার কথাই বলতে চাই। এমনিতেই ত্রিপুরায় প্রশাসনিক কাঠামোতে অনেক ঘুণ। বহু ঘুঘুর একত্রিত সহাবস্থানে ত্রিপুরা প্রশাসন বহুকাল যাবৎই একটি ঘুঘুর বাসায় পরিণত এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট কারণে এই সরকারি ব্যবস্থার পর স্থানীয় জনসাধারণ রীতিমত অসন্তুষ্ট। বাংলাদেশের সংগ্রামকে মানুষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে শুভ আহ্বান জানাচ্ছে, সরকার যে শরণার্থী সমস্যায় বিপর্যস্ত তাও অনুধাবন করছে। কিন্তু এটাইতো সময় সরকারের সুনাম অর্জনের।"

শরণার্থী সমস্যায় সমাজের অন্যান্য অংশের মতো স্কুল-কলেজের পড়ালেখারও প্রভূত ক্ষতি হয়। কেবল আগরতলা কেনো রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশের দেশত্যাগী মানুষ। ঠিক এমনি সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় পড়ে শিক্ষা বিভাগ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কুলগুলো খোলার একটা উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তাদের সে উদ্যোগ সফল হয়নি সমাজের প্রায় প্রতিটি অংশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে। ত্রিপুরা সমাজের বিবেকবান অংশ নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার চরম ক্ষতি স্বীকার করেও শরণার্থীদের ঠাঁইহীন করতে রাজি হননি। কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ-নিয়ে একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তখন। 'দৈনিক সংবাদ'-এও প্রকাশিত হয়েছিলো একটি চিঠি,

আগরতলা শহরের কয়েকটা বিদ্যালয়সহ মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ত্রিপুরার প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শরণার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ। ছাত্র আসে না, কোন ঘর খালি নেই, শিক্ষকদের বসবার জায়গা নেই। বিদ্যালয়ের চারপাশ আবর্জনায় ভরা, বাতাসে দুর্গন্ধ ভেসে আসে, অথচ কর্তৃপক্ষ নির্ভাবনায় ঘোষণা করলেন স্কুল

খুলতে হবে।”

যেকোনো যুদ্ধাবস্থায় প্রশাসনের ব্যতিব্যস্ততার অন্ত থাকে না। তার ওপর আবার এক-দু'শ' নয় লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি স্থানীয় জনজীবনের ওপর এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে তাকে তার প্রতিপক্ষদের আক্রমণের শিকারে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এছাড়াও সুযোগসন্ধানী ও লুটেরাদের কার্যকলাপ এ-সময়ে নিয়ন্ত্রণে রাখাও প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের রাজ্য সরকার নিশ্চিতভাবেই এমন বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বিব্রত হয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু পত্রপত্রিকা, বিশেষত 'দৈনিক সংবাদ' ও 'সমাচার'-এর গঠনমূলক ও সহায়ক ভূমিকা মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রশাসনকে চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করতে সাহায্য করেছিলো।

শুধু আগরতলা নয় মহানগরী কলকাতাও এই সময়সীমায় বিপর্যস্ত হয়েছিলো বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যার ভারে। আগস্ট মাস নাগাদ পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী ঢুকেছিলো ৫২ লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি। সীমান্তের শিবিরগুলোতে আশ্রয় না পেয়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যত্র। খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায়, ফুটপাতে, রেল স্টেশনে—সব জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো তারা। সাংবাদিক অমিত মিত্র সে সময় স্থানীয় একটি দৈনিকে কলকাতা থেকে যে প্রতিবেদন লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

কোলকাতার ফুটপাত এবং শহরতলীর বিশেষ করে রেল স্টেশনগুলোতে এমনিতেই পূর্ব থেকে নিরাশ্রয় মানুষ আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তাছাড়া আছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খেটে-খাওয়া মানুষ, বিশেষ করে বিহারীরা, যারা কোলকাতায় ফুটপাতের স্থায়ী বাসিন্দা। উপরন্তু বর্তমানে শরণার্থীরা আসায় কোলকাতার বাসিন্দার সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে যে ভালভাবে হেঁটে বেড়ানো দুষ্কর হয়েছে। শিয়ালদহ, হাওড়া এবং প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে বাসিন্দাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ট্রেন চলাচলে প্রায় বিপর্যয়। কোলকাতায় কয়েকটি রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ।”

সীমান্তের গা-ঘেঁষা বলে এবং মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যময় কেন্দ্রস্থল বলে আগরতলা ছিলো পাকিস্তানি সেনাদের মূল আক্রমণের লক্ষ্য। আগস্ট মাস থেকে যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত রাতের বেলায় কার্ফু জারি থাকতো আগরতলায়। সান্ধ্য আইন জারি করে কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানি এজেন্টদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করতে চাইলেও মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে আগরতলা পাকিস্তানিদের কামানের গোলায়, তাদের পুঁতে রাখা মাইনে। নাশকতামূলক কাজ সংঘটিত হয়েছে প্রায় প্রতিদিন। মারা গেছে অনেক ত্রিপুরাবাসী।

ধ্বংস হয়েছে তাদের অনেক সহায়-সম্পদ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা এলে ইন্দিরা গান্ধীর কথা তোলা কেবল স্বাভাবিক নয়, অত্যাবশ্যকীয়ও। ৯ আগস্ট ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এক জনসমাবেশে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) শরণার্থীরা যাঁরা এখানে এসেছে তাঁরা এখানে নিমন্ত্রণ খেতে আসেনি। তাঁরা আক্রান্ত, বিপন্ন। বিশ্বের কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত এত বিরাটসংখ্যক শরণার্থীর দায় নেয়নি। ভারতেরও সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভারত তার মানবিক দায়িত্ব ও দায় থেকে চ্যুত হতে পারে না বা কারও ভয়ে ভীত হয়ে সে দায়িত্ব পালনে বিরত হবে না।"

কলকাতার সল্টলেক আর আগরতলা—এই দু' জায়গায় সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিনিধিরা ঘুরে গেছেন একাত্তরের দেশত্যাগীদের দুর্দশা দেখতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাকে মুক্ত পৃথিবীর মুখ্য প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সেদিনকার সরকার বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে ছিলো না। ছিলো না গণচীন, ছিলো না বেশকিছু আরব রাষ্ট্রও। রাজতন্ত্রী মুসলিম দেশগুলো ছিলো না 'ইসলাম বিপন্ন' এ জাতীয় পাকিস্তানি ভাঁওতাবাঁজির ফাঁদে পড়ার কারণে। চীন থাকেনি ভারতের সাথে এই মুক্তিযুদ্ধের সংযোগ ও পাকিস্তানের সাথে তার বন্ধুত্বের কারণে। কিন্তু গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন একটি জাতির মুক্তিসংগ্রাম-বিরোধী এবং গণহত্যার পক্ষে ভূমিকা নিয়ে কি আমেরিকানদের মানবাধিকার বা মূল্যবোধ সংক্রান্ত দাবির সম্মান রাখতে পেরেছিলেন ? না, পারেননি। আর সবকিছু বাদ দিলেও আমাদের এ অঞ্চলে সমসাময়িককালে বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামে আমেরিকানদের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা তাকে একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আর স্বাধীন সংবাদপত্র তাঁদের ভূমিকার কল্যাণে বোধকরি সরকারি পাপকে মোচন করতে পেরেছিলেন কিছুটা। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'টাইম' ও 'নিউজউইক' ইত্যাদি সংবাদপত্র; বৃটেনের 'গার্ডিয়ান', 'লণ্ডন টাইমস' এবং 'টেলিগ্রাফ' জোরালো ভূমিকা রেখেছিলো পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে।

সুদূর আমেরিকা থেকে সেদিন ছুটে এসেছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতা ও আগরতলায়। ১২ আগস্ট এসেছিলেন কেনেডি ত্রিপুরা রাজ্যে। বিমানবন্দর থেকে রাজনিবাসের দু' ধারে বিপুল জনতা। সেদিনকার সেই অবিশ্বাস্য ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থী আর ত্রিপুরাবাসী। শ্লোগান উঠেছে—'এডওয়ার্ড কেনেডি জিন্দাবাদ', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ'। বিমানবন্দর থেকে জে.বি. হাসপাতাল, সেখান থেকে রাজনিবাস। রাজনিবাস থেকে মোহনপুর, মোহনপুর থেকে গোকুলনগর, গোকুলনগর থেকে সার্কিট

হাউস। কেনেডি এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, এসেছিলেন শরণার্থী সংক্রান্ত সিনেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে। সেই তখন একাধিক শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখেছেন তিনি। দেখেছেন ধর্মের নামে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে নিরস্ত্র জনতার ওপর কতো নির্মম আর পাশবিক হতে পারে একটি দেশের সেনবাহিনী। কেনেডির সেদিনকার সহানুভূতি তাই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে আরেক স্মরণীয় অধ্যায়।

সেদিন তেমন কিছু বড়োসড়ো বক্তৃতা দেননি কেনেডি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু জানিয়েছিলেন, মার্কিন সরকার যেন পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সরবরাহ না করে তার চেষ্টা তিনি করবেন। পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে শেখ মুজিব যাতে মুক্ত হতে পারেন সে চেষ্টাও চালাবেন তিনি। আগরতলা মার্কিন হাউজে দেশত্যাগী বাংলাদেশের একদল বুদ্ধিজীবীর সাথেও সেদিন মিলিত হয়েছিলেন কেনেডি এক গোপন বৈঠকে। সেই বৈঠকে কেনেডিকে জর্জরিত করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা নানান প্রশ্নে। কেনো তাঁর সরকার একটি জাতির মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করছে ? কেনো যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রে বাংলার মাটি রঞ্জিত হচ্ছে ? সিনেটর কেনেডি সেদিন যথার্থ কোনো উত্তর দিতে পারেননি সেইসব প্রশ্নের।

ভারতে অবস্থানরত বিপুলসংখ্যক শরণার্থী যাতে দ্রুত দেশে ফিরে যেতে পারে সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এপ্রিল-মে থেকেই চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রথমাবস্থায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রভাবশালী একটি দেশ বিরুদ্ধাচরণ করাতে সেই ভারতীয় প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি। অন্যদিকে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট-বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী বন্ধু হওয়ায় ধনিক পশ্চিমা-বিশ্ব তাৎক্ষণিকভাবে সেদিন এগিয়ে না আসলেও ওইসব দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা মুক্তি ও শান্তিকামী সাধারণ মানুষ শরণার্থীদের সাহায্যার্থে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন ক্রমে। ভারত সরকারের যখন এমন দুর্দিন, পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলো যখন প্রতিনিয়ত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রকাশ্য অভিযোগ করছে, ওই রকম অবস্থাতেও শ্রীমতী ইন্দিরা সাহস হারাননি। ২৪ মে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রকৃত অবস্থা সুনিশ্চিত করতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি এগিয়ে না আসে কিংবা ব্যর্থ হয়, তবে ভারত যেকোনো ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।" সেদিন ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতিতে শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে 'নৈরাশ্যজনক' বিশ্ব নীরবতার কথা প্রকাশ পেয়েছিলো। তাঁর সুস্পষ্ট যুক্তি, যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের নিরাপত্তার সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি দেয়া না যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্বদেশে ঠেলে দেয়া বর্বরতা ছাড়া

আর কিছুই নয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীর সহযোগিতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের পুরনো কথাকাহিনী জানার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি যখন আগরতলায় যাই তখন কুড়ি বছর আগেকার সেই স্মৃতি অনেকেরই মন থেকে প্রায় দূরীভূত। কেউ কেউ বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে। কেউ কেউ সরাসরি বলেও ফেলেছেন, ওসব লিখে আর কি হবে ! কথার শেষ নেই, দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু এর পরেও আগরতলার প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি সংস্থা প্রতিটি জ্ঞাতব্য বিষয়ে অবারিত করেছিলেন তাদের মনের দুয়ার।

২৫ মার্চের গণহত্যা সূচনার চল্লিশ দিন পর জাতিসংঘের উদ্বাস্তু দপ্তরের ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর কয়েকজন সহকারী নিয়ে পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরাসহ ভারতের রাজ্যগুলো সফরে এসেছিলেন দেশত্যাগীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে। মজার ব্যাপার, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রতিনিধিরা যেদিন আগরতলায়, সেদিন অকস্মাৎ কামানের গোলা পড়তে থাকে ত্রিপুরার মাটিতে। মানবতাকে অভ্যর্থনা জানানোর নতুন পাকিস্তানি পদ্ধতি ! রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের প্রতিবেদনটি আমার পড়বার সুযোগ হয়নি। কিন্তু পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরার শিবিরগুলোতে শরণার্থীদের সাথে কথা বলে বোধ করি তাঁরা বুঝেছিলেন, 'জয়বাংলা'র সত্যিকার জয় না হলে এই দেশত্যাগীদের দেশে ফেরার ব্যাপারটি সহসাই সুগম হবে না।

আমাদের এই গ্রহেরই কিছু কিছু রাষ্ট্র তাদের কূটনৈতিক কৌশল বা রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধির কল্যাণে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদীরা পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ আর নির্যাতনকে শুধু নিন্দাই জানায়নি, সেই সাথে ছুটে এসেছিলেন তাঁরা ভারত সীমান্তের শিবিরগুলোতে সহানুভূতি জানাতেও। বৃটেনের খ্যাতনামা সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী জনক্রিসও ত্রিপুরায় এসেছিলেন। পরিস্থিতি সরেজমিনে জরিপ করার পর তাঁর মন্তব্য ছিলো, "... মিস্টার জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং অবৈজ্ঞানিক ভৌগোলিক বিভাজনে পাকিস্তানের সৃষ্টি বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে আজ অসার বলেই প্রমাণিত।" জনক্রিস এক সময় 'হাউস অব লর্ডস'-এর সদস্য ছিলেন। লর্ডশিপ ত্যাগ করে ঢুকেছিলেন তিনি সাংবাদিকতায়। অক্টোবরে মোহনপুর ও মধুপুর শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে জনৈক কিশোরী এবং গ্রামের একজন সরল বধূ তাদের পরিবারের ওপর পাক সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের কাহিনী তাঁকে যখন শোনাচ্ছিলো, তখন সেই বিদেশীর পক্ষেও তাঁর চোখের পানি সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিলো।

পশ্চিম বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের এককালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগও শরণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা এবং মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় অংশগ্রহণের তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছিলো। ২০ অক্টোবর

তিনি বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। শরণার্থীদের মনোবল দৃঢ় করার জন্য হাপানিয়া শিবিরে তিনি বলেন, "স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দুর্বার সংগ্রাম আজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে তার পূর্ণ সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।" এর পাশাপাশি পশ্চিম বাংলার প্রগতিবাদী বাম দল সিপিএম এবং তার সহযোগী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় উদ্যোগও রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের সর্বতোমুখী অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে সুদৃঢ় করেছিলো। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিলো ত্রাণ কমিটি।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘুরে গেছেন আগরতলা ও ত্রিপুরার শিবিরগুলো। স্বচক্ষে দেখে গেছেন কতোটুকু নির্যাতিত আর বর্বরোচিত হামলা হলে মানুষ নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ৫ অক্টোবর হাপানিয়া শরণার্থী শিবিরের দেশত্যাগীদের সাথে দেখা করে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

শিবিরে অবস্থানরত শরণার্থীদের জন্যে ভারত সরকার যা করছে তা অপ্রতুল হলেও সারা ভারতের আন্তরিকতা এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে। ভারত সরকারের হয়ে আমার কোনো কথা বলার অধিকার না থাকলেও ভারতবাসী হিসেবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে এই কথা বলতে পারি, প্রত্যেক ভারতবাসীই আজ বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সাথে মনেপ্রাণে যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়-পরাজয় আজ প্রত্যেক ভারতবাসীই তাদের শুভ চেতনার জয়-পরাজয় বলে ধরে নেবে। নিপীড়িত মানুষের অধিকার লাভের আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতবাসী সর্বতোভাবেই সহযোগিতা করে যাবে, আর এ জন্যে যতো বড়ো ঝুঁকিই নিতে হোক না কেন তার জন্যে সারা ভারতের মানুষ মানসিকভাবে প্রস্তুত।"

ত্রিপুরায় জয়প্রকাশের আগমন সংবাদে হাজার হাজার শরণার্থী তাঁকে স্বাগত জানায়। সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমাণ্ডার মেজর মীর শওকতের পক্ষ থেকে তাঁকে বার্তাও পাঠানো হয়। অবহিত করা হয় মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতির খবর।

আন্তরিকতা সত্ত্বেও ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্যাম্পে জনসংখ্যার চাপে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। শরণার্থী জীবন কখনোই সুখের নয়, হতে পারে না। এমনি ধরনের অসুখ-বিসুখে মারাও গেছে অনেকে। যেখানেই আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে ত্বরিত ছুটেছে সেখানে মেডিক্যাল টিম। এতে করে হয়তো পরিস্থিতির ত্বরিত উন্নতি হয়নি। কিন্তু সাধ্যমত সেবা এবং সহযোগিতার অভাব ছিলো না।

১৫ অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরার তিনটি জেলায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের যে সংখ্যা রেজিস্ট্রি করা হয়েছিলো তার মোট সংখ্যা ছিলো ১২৪৭৩৩২ জন। রেজিস্ট্রি বহির্ভূতদের সংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১১৯০০০ জন। পশ্চিম ত্রিপুরায় এই সংখ্যা ছিলো ৬৮৩৯৯৬ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৪১১৩১৫ জন এবং উত্তর ত্রিপুরায় ১৫২০২১ জনের রেজিস্ট্রিকৃত নাম সরকারি নথিপত্রে পাওয়া গেছে।

পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে। ভৌগোলিক কারণেই ১ থেকে ৪ নম্বর সেক্টরের সীমানা ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার সাথে গাঁথা ছিলো। সিলেটের সুনামগঞ্জ-ডাউকি-বাঁশতলা-জৈন্তাপুর ইত্যাদি নিয়ে যে ৫ নম্বর সেক্টর তাও এক অর্থে ত্রিপুরা সীমান্তঘেঁষা। অন্যদিকে ১০ নম্বর নামে যে সেক্টরটিকে ধরা হতো সেটাও তার তৎপরতার দিক থেকে যুক্ত ছিলো ত্রিপুরার সাথে, যদিও তা ভারতের মিজোরাম আর বার্মার সীমান্ত সংলগ্ন। ১০ নম্বর সেক্টর মুক্তিফৌজের নৌ-কমাণ্ডোদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এই সেক্টরে কোনো বিশেষ কমাণ্ডার নিয়োগ করা হয়নি।

এ ছাড়াও ছিলো অতিরিক্ত টাঙ্গাইল সেক্টর। এই সেক্টরের সীমানা ১১ নম্বর সেক্টরের মধ্যে পড়লেও এই রণাঙ্গনের অধিকর্তা বীরযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী শেষ পর্যন্ত এককভাবেই এর নিয়ন্ত্রণভার বহন করেছেন এবং সাফল্যের সাথেই। সেই সময়কার গ্রুপ ক্যাপ্টেন, পরে এয়ার ভাইস মার্শাল ও জেনারেল এরশাদের মন্ত্রী এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ছিলো ক্ষুদ্র আকারের একটি বিমান বাহিনী। যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল (অবঃ) আতাউল গনি ওসমানী (কর্নেল ওসমানী নামে খ্যাত—আওয়ামী লীগের এককালীন মন্ত্রী এবং পরে জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান)। এছাড়াও হেড কোয়ার্টার্সের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার, মেজর জেনারেল রব (চিফ অব স্টাফ), মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম, কর্নেল এ. টি. এম. সালাউদ্দিন, উইং কমাণ্ডার সামসুল আলম, লেঃ কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী (পরবর্তীকালে ৮ নম্বর সেক্টরের প্রধান), লেঃ কর্নেল আবদুল মালেক মোল্লা, লেঃ কঃ এনামুল হক, স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম, মেজর ফজলুর রহমান, মেজর ফাত্তাহ চৌধুরী, ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ), মেজর শামসুল আলম, কেঃ মঈনুদ্দিন আহমদ, শেখ আনোয়ার হোসেন এবং লেঃ শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র)।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশে ১১টি সেক্টর ও সাব-সেক্টরের বাইরে গঠিত হয়েছিলো তিনটি স্বতন্ত্র বাহিনী। এই বাহিনীগুলোর একেকটি ব্রিগেড আকারে ছিলো এবং এগুলো মূলত নিয়মিত সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় গড়ে উঠেছিলো। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছিলো তাদের স্ব-স্ব অধিনায়কদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে। যেমন, লেঃ কঃ জিয়াউর রহমানের অধীনে ছিলো 'জেড ফোর্স', লেঃ কঃ এম. শফিউল্লাহর নেতৃত্বে ছিলো 'এস ফোর্স' এবং লেঃ কঃ খালেদ মোশাররফের কর্তৃত্বে ছিলো 'কে ফোর্স'। এই ফোর্সগুলো যখন যেখানেই নিয়োজিত থাকতো সে এলাকার সেক্টর কমাণ্ডারের

সাথে যৌথভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথমে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'জেড ফোর্স'-এর একজন সৈনিক এবং একই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় নিযুক্ত 'যুদ্ধ সংবাদদাতা' হিসেবে কাজ করার সুযোগ ঘটেছিলো আমার। পরবর্তীকালে আসাম-মেঘালয় সীমান্ত (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর সংলগ্ন) থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে 'জেড ফোর্স'কে সিলেট সীমান্তে বদলি করা হলে আমি ১১ নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার লেঃ কঃ আবু তাহেরের সাথে পুরনো এলাকায় থেকে যাই। মুক্তিযুদ্ধে 'জেড ফোর্স' এবং পরবর্তীকালে ১১ নম্বর সেক্টর ছিলো এই গ্রন্থ রচয়িতার মূল কর্মস্থল। জিয়া এবং তাহেরকে তাই জাতীয় ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণ থেকে স্বাধীন স্বদেশের আরেক রক্তাক্ত রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে একজন সাংবাদিক হিসেবে, সেইসাথে ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে প্রসঙ্গ এখানে থাক।

ত্রিপুরা রাজ্য ঘেঁষে যে ৪ নম্বর সেক্টর গড়ে উঠেছিলো সেটা নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। এপ্রিলের প্রথম থেকে জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ 'জেড ফোর্স' গঠিত হবার আগ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসার হিসেবে এই সেক্টরে কর্তৃত্ব নিয়েছেন সেই সময়কার মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি)। কিন্তু ১ নম্বর সেক্টরের প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর মুখ্য অধিনায়ক ছিলেন বীরযোদ্ধা মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টরের সীমানা ছিলো পুরো চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারিত। হরিনা, সাব্রুম ও সীমান্তবর্তী স্থানগুলোতে একাধিক মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরও গড়ে উঠেছিলো এই সেক্টরের অধীনে। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হবার পর এবং মুক্ত চট্টগ্রামের পতনের পর জিয়াউর রহমান ও অধিকাংশ সৈনিক রামগড় হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম পৌঁছান এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ এবং পাকিস্তানিদের নারকীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সেই সময়কার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এস. এ. ভুঁইয়া (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার) তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ২৫শে মার্চ। রাত তখন প্রায় একটা। ছায়া-শ্যামলিমা ঘেরা পাহাড়-পরিবৃত বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ঘুমে নিমগ্ন। বীর প্রসবিনী চট্টলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ছাউনিতেও ঘুম তখন তার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। ২০ নং বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্য বোঝাই ছয়টি ট্রাক এসে ধীরে ধীরে রেজিমেন্ট সেন্টারের অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়ালো। ত্রস্ত পদক্ষেপে অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকরা ট্রাক থেকে নেমে পড়লো। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা অস্ত্রাগারে আধিপত্য বিস্তার করলো। অস্ত্রাগারে প্রহরারত

রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা আকস্মিক আক্রমণে প্রাণ হারালো। প্রহরারত বাঙালি সৈনিকদের নির্মমভাবে খতম করে দিয়ে পশ্চিমা দস্যুরা সেন্টারের চতুর্দিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো, তারপর শুরু হলো তাদের সুপরিকল্পিত পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ।"

চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারে মেজর জিয়ার নিজের তরফ থেকে এবং পরে শুদ্ধ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন, সেটা আজ আমাদের জানা ইতিহাসের বিশেষ অংশ। আমি শুধু বলবো, সেদিনকার সেই অখ্যাত মেজর জিয়ার কণ্ঠ মারফত সেদিন ওই ঘোষণা দৈবাৎ ধ্বনিত হলেও ইতিহাসের শাশ্বত নিয়মেই সেই মেজরটি আর দশজন সাধারণ মেজর বা অন্যসব সেক্টর কমাণ্ডারের মতো থাকেননি। পরবর্তীকালে আসাম-মেঘালয় সীমান্ত বরাবর 'জেড ফোর্স'-এর তেলঢালা ক্যাম্পে মেজর জিয়ার সাথে অনেকবারই এ-নিয়ে কথা হয়েছে আমার। জানতে চেয়েছি, কেমন করে, কী পরিস্থিতিতে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন তিনি। স্মিত হেসে স্মৃতিচারণ করেছেন জিয়া। তবে যুদ্ধ চলার সময়ে এনিয়ে কোনোরকম বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। কারণ জিয়া সাহেবের তখন কোনো রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ ছিলো না। তবে যে পরিস্থিতিতে, যে পদ্ধতিতেই ভাষণটি প্রচারিত হোক না কেনো, সেটা প্রায় সারাদেশের মানুষের কানে পৌঁছেছিলো এবং জাতির গভীর হতাশার ভেতরে সঞ্চার করেছিলো নতুন আশা ও উদ্দীপনার। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান সাহেব বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে যে ঘোষণাটি পূর্বাহ্নেই প্রচার করেছিলেন, সেটা শুনবার ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছিলো।

স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বিতর্কে, আমার মনে হয়, রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কেউই অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ একটি দেশের বা জাতির মুক্তিযুদ্ধ কেবল একজন মেজরের বেতার ভাষণে পরিচালিত বা সম্পন্ন হয় না। যাঁরা এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করছেন এখনো তাঁরা পরোক্ষভাবে নিজেদের 'নব্য হিরো' বানাবার অপচেষ্টা করছেন বলেই ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা ! চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার সুবাদে জিয়াউর রহমান দৈবাৎ ইতিহাসের নায়ক হয়েছেন। কেবল একটি ঘোষণার ভেতর দিয়েই যে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, হতে পারে না, সুদীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়নি, হতে পারে না, জাতির সংগ্রামী হৃদয় তৈরি হয়নি, হতে পারে না সেটা ধীমান সঙ্কীর্ণতা-শূন্য ধীমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝবেন।

১ নম্বর সেক্টরের লাগোয়া ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ, পরবর্তীকালে মেজর দুর্ধর্ষ গেরিলা কমাণ্ডার এ.টি.এম হায়দার (এঁদের দু'জনই '৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)। এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি

গড়ে উঠেছিলো কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও শরিয়তপুরের কিছু অংশ এবং মুন্সীগঞ্জ এলাকা নিয়ে। রাজধানী ঢাকার মূল জায়গায় "অপারেশন' থেকে শুরু করে এর শহরতলিতে পর্যন্ত পাকিস্তানিদের জন্যে ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এই সেক্টরের দুঃসাহসী গেরিলারা। মেলাঘর, গঙ্গাসাগর, কসবা, শালদা নদী, মিয়াবাজার, বেলোলিয়া ও চৌদ্দগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল ২ নম্বর সেক্টরের মুক্তিসেনারা। তারা আহত ও নিহত হয় এবং শত্রুসেনাদের পর্যুদস্ত করে।

৩ নম্বর সেক্টরের প্রাণকেন্দ্র ছিলো কলাগাছিয়া, আখাউড়া, পুরুলিয়া ও দরুইন ইত্যাদি জায়গা। এই সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন প্রথমে মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ও পরে মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে ছিলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুরসহ টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জের কিয়দংশ। ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর সি. আর. দত্ত। সুনামগঞ্জ, মৌলবীবাজার, জকিগঞ্জ ও সিলেট এলাকাতেও এই সেক্টরের বাহিনী তৎপরতা চালিয়েছে। মেজর মীর শওকত আলীর অধীনে ছিলো ৫ নম্বর সেক্টর। সুনামগঞ্জের কিছু অংশ, সিলেট, জৈন্তাপুর, ছাতক, বাঁশতলা ও জকিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে তৎপরতা চালিয়েছে এই সেক্টরের মুক্তিসেনারা।

মুক্তিবাহিনীতে ১ নম্বর সেক্টর এবং পরবর্তীকালে 'জেড ফোর্স'-এ কর্মরত অধিকাংশ সেনা অফিসারকে আমি যুদ্ধাবস্থা থেকেই চিনতাম। জিয়াউর রহমান ছাড়াও বিভিন্ন সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মহসিন উদ্দিন, যাঁকে জিয়া হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত করে পরবর্তীকালে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল, কর্নেল আনোয়ার হোসেন, কর্নেল আমিন আহমদ চৌধুরী, কর্নেল অলি আহমদ, কর্নেল পাটোয়ারী, কর্নেল নূরুন্নবী খান ও কর্নেল আকবর হোসেনসহ আরও অনেকে। যাঁদেরকে চিনতাম, জানতাম, যাঁদের পেয়েছি বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাথী ও অধিনায়ক হিসেবে তাঁদের অনেকেরই চাকরি ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পদোন্নতি হয়েছে এবং তাঁদের অধিকাংশই আবার সেনাবাহিনী ছাড়তে বাধ্যও হয়েছেন—নয়তো স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পন্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ওপর যে ক'টি পুস্তক রচিত হয়েছে তার সবগুলোর ভেতরে কেবল মেজর বা জেনারেলদেরই বীরত্বগাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসব গ্রন্থে অগণিত দুঃসাহসী যুবক, তরুণ, ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়নি বললেই চলে। বলতে গেলে কেউই ইতিহাসে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আমি সেই অজানা আর অখ্যাত অগণিত জাতীয় বীরদের

প্রতি জানাই আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি। অখ্যাত-অপরিচিতদের অবদানের ইতিহাস কেউ মনে রাখে না। হতে পারে এটাই ইতিহাসের ধর্ম। কিন্তু এই অখ্যাত-অজানাদের হাতেইতো গড়ে ওঠে ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের সেই অবদানেরই পরিণতি।

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকেই ত্রিপুরাতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের বিপুল অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। সেই সাথে সেই সময়কার এম. এন. এ ও এম. পি. এ-রাও একে একে পাড়ি দিতে থাকেন আগরতলায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহের নায়করা–মেজর জিয়া, মেজর রফিক, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া ও ক্যাপ্টেন অলিসহ অসংখ্য বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার কাপ্তাই, রাঙামাটি, মহালছড়ি হয়ে রামগড়ে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে চলে আসেন সাব্রুম দিয়ে আগরতলায়। রামগড়েও অস্থায়ীভাবে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প স্থাপিত হয়। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়।

যদ্দুর জেনেছি, মার্চ মাসের ২৭ তারিখে চাঁদপুরের সেই সময়কার ছাত্রলীগ নেতা মুনির আহমদ আগরতলা এসে পৌঁছাবার পর থেকেই রাজ্যের কর্তাব্যক্তিদের অনেকের কাছে পূর্ববাংলার ভেতরে সংঘটিত গণহত্যার ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মুনিরের সাথে ছিলেন দু'জন ভারতীয় সাংবাদিক—যাঁদের নাম সংগ্রহ করা যায়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতায় আগরতলাকেন্দ্রিক যে ব্যক্তিটির নাম সর্বাধিক পরিচিত, সেই অনিল ভট্টাচার্যের ভাষায় "মুনির আহমদ ও দুই সাংবাদিককে পুলিশের ওপরের দিককার অফিসাররা যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তখন কলকাতার এই দুই সাংবাদিক আমার নাম বলে ফেলেন। সাথে সাথেই আমার ডাক পড়ে। আমি গিয়ে এই দুই অতি-উৎসাহী তরুণ সাংবাদিকের সাথে কথা বলে পরিচয় জানতে পারি। তাঁরা মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই জীবনবাজি রেখে পূর্ববাংলায় ঢুকে পড়ে।"

এপ্রিলের ২ তারিখে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে নিজস্ব গাড়ি করে আগরতলায়প্রবেশ করেন আওয়ামী লীগ নেতা সর্বজনাব আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নূরুল হক এবং খুলনার মহসিন সাহেব। শুরু হয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বিপুল হারে আগমনের ঘটনা। অন্যদিকে রামগড় হয়ে চলে আসেন আওয়ামী লীগের মুখ্য নেতা চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মান্নান,, আব্দুল হান্নান, এম. আর. সিদ্দিকী, আবদুল্লাহ-আল-হারুন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও মোশাররফ হোসেনসহ অসংখ্য নেতা। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরেই দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা আগরতলায় এসে পৌঁছুলেও প্রবাসী সরকার গঠনের ব্যাপারে ত্বরিত কোনো সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারেননি। তাজউদ্দিন

আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রমুখ প্রথম কাতারের নেতা যাঁর যাঁর সুবিধাজনক গোপন পথে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে পর্যায়ক্রমিক কথাবার্তা হয় নেতৃবৃন্দের। প্রবাসী বা বিপ্লবী সরকার গঠনে প্রধান যে অন্তরায় তখন কাজ করেছিলো তার ভেতরে অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং ভারত সরকারের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার অভাব।

এই রকম মুহূর্তে এ ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ নিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ। আওয়ামী লীগের কয়েকজন সংসদ সদস্যকে (যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এম.এন.এ এডভোকেট সিরাজুল হক এবং এম.এন.এ এম. আর. সিদ্দিকী) নিয়ে তিনি চলে গেলেন নয়াদিল্লি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে। বলতে গেলে তাঁরা ফিরলেন একটা সন্তোষজনক আলোচনা করেই। এই আলোচনার অব্যবহিত পর থেকে অর্থাৎ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধে তার সতর্ক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সম্ভবত তারিখটি ছিলো '৭১ সালের এপ্রিলের ২। খেলার মাঠে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের টিনের বাড়িটি দেশত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রভাবশালী কর্মীতে ঠাঁসা। বাড়িটিকে অনিলের না বলে তাঁর সহধর্মিণী সুনন্দা ভট্টাচার্যের সরকারি বাসভবন বলাটাই ঠিক হবে। কারণ বাড়িটি রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা মিসেস ভট্টাচার্যের নামে বরাদ্দ ছিলো।

আওয়ামী লীগের ৩৫ জন এম.এন.এ ও এম.এল.এসহ বেশ ক'জন ছাত্রলীগ নেতা এবং কিছু বাঙালি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বিশ্ববাসীর কাছে সর্বপ্রথম একটি যৌথ বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এই সভায়। Stop this Genocide—বন্ধ কর এই গণহত্যা—এই শিরোনামে ইংরেজিতে তৈরি হলো ওই যৌথ বিবৃতির খসড়া। চট্টগ্রামের আবদুল্লাহ-আল-হারুন যোগ্য ভূমিকা রাখলেন এই বিবৃতি তৈরিতে। তাঁকে সহায়তা করলেন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক সুভাষ চক্রবর্তী। প্রবীণ জননেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা থেকেই বাংলার জনপ্রতিনিধিদের যে যৌথ বিবৃতি প্রচারিত হলো, সেটাই বিশ্ববাসীর কাছে পাকিস্তানি গণহত্যা বন্ধের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম আবেদন। সারা পৃথিবীতে তা প্রচারিত হয়েছিলো।

প্রথম বিপ্লবী সরকার গঠনে যতো দেরি হচ্ছিলো সুসংহতভাবে মুক্তিযুদ্ধ

পরিচালনার ব্যাপারটি ততোই পিছিয়ে পড়ছিলো। কিন্তু বাস্তব অসুবিধের কারণেই তা হয়ে উঠছিলো না। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈনিক, যাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগরতলায় এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁরাও এ-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মেজর ভুঁইয়া লিখেছেন, দেখতাম মেজর জিয়াও সরকার গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের বহু উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আগরতলায় পৌঁছেছেন। ঐ সময় মেজর জিয়াকে দেখতাম সরকার গঠনের ব্যাপারে আগরতলায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আসা-যাওয়া করতে।"

১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিদ্রোহ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনিই রামগড় থেকে সাব্রুমে এসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি এক ঝটিকা সফরে রামগড়ে চলে আসি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের কাছ থেকে রসদ ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্যে। বি.এস.এফ-এর অফিসারদের সাথে আমার সাব্রুমে আলোচনা হয়। তাঁরা দ্রুত আমাকে ব্যবস্থা করে দেন, যাতে আগরতলায় আমি সিনিয়র অফিসারদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি, এমন কি প্রয়োজনে দিল্লি পর্যন্ত যেতে পারি। ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি শুধু বিস্মৃতই হয়নি, সেই সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদের প্রস্তুতিও ছিলো না। ভারত সম্ভবত সেনাবাহিনীর একটা 'ক্র্যাক ডাউন' অবশ্যম্ভাবী ধরে নিয়েছিলো এবং ধরে নিয়েছিলো এতে কিছুসংখ্যক লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করবে। কিন্তু বাঙালি ই.পি.আর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিদ্রোহ ও ব্যাপক গণহত্যা ভারত সরকারের চিন্তার বাইরে ছিলো।"

আগরতলায় তাঁর প্রথম আগমন উপলক্ষে মেজর রফিকুল ইসলাম বলেছেন "২রা এপ্রিল যখন আমি আগরতলায় আসি তখন বি.এস.এফ-এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মিস্টার কালিয়ার কাছে আমাকে নেয়া হলো। আমি তাঁকে আমাদের যুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা দিলাম এবং সামরিক সাহায্য চাইলাম ! মিস্টার কালিয়া বললেন, অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ সংক্রান্ত আমার অনুরোধটি রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন এবং আমাকে অন্তত একদিন সে জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এরপর একদিন থেকে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো পথ রইল না।"

শুধু তাই নয়, এই বাঙালি মেজর পরদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে বৈঠক করেন এবং সাহায্য চান। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আগত কিছু শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও মেজর রফিকের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকদফা বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে ৯২ বি.এস.এফ. ব্যাটালিয়ন থেকে কিছু গোলাবারুদ সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। সারাদেশে তখন নরমেধযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে পাকবাহিনী। দলে দলে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিচ্ছে ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে। অন্যান্য শহরাঞ্চলে যাই হোক, বীর চট্টলায় শক্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো পাকবাহিনী। কিন্তু ৪ এপ্রিল বাঙালি সৈনিকদের সেই প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। চট্টগ্রামে পাকিস্তানিরা ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ঘটায় এবং শহরাঞ্চল ও কালুরঘাট [যেখান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিলো] বেশ ক'টি বড়ো ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে। জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। কুষ্টিয়ায় ২৮ মার্চে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ৪ ই.পি.আর-এর মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। কিন্তু সারা বাংলায় বাঙালি ই.পি.আর, পুলিশ ও বাঙালি সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের পরও তখনো একটা অভাব প্রকটভাবে বোধ হচ্ছিলো আর সে অভাব ছিলো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় একটা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারের।

যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বোধ করি ব্যাপারটি বুঝতেন। ১২ এপ্রিল আগরতলা সার্কিট হাউসে অত্যন্ত সংগোপনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক সভা বসে। নিরাপত্তার স্বার্থেই আগরতলায় ঠাঁসা দেশী-বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় সেই সভায়। এই সভাতেই গঠিত হয় প্রথম স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকার। এই গোপন সভারই চারদিন পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, আগরতলায় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে কেনো তা ঘোষণা করা হলো ? সে সময়কার সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে ও পুরনো পত্রপত্রিকা ঘেঁটে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার নিজের প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেছি আমি। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে আখাউড়া, যা আগরতলা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে, ছিলো পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। মোটকথা, ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর এমন কোনো নিরাপদ জায়গা বা মুক্তাঞ্চল ছিলো না যেখানে সরকার ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা সমাধা করা যেতে পারতো নির্বিঘ্নে। অথচ ভারতের মাটিতে না হয়ে বাংলাদেশের যেকোনো মুক্তাঞ্চলে ঘোষণাটি যে হওয়া ছিলো বাঞ্ছনীয়, সেটা অনুধাবন করা মোটেও কষ্টকর ছিলো না। ভারত সরকার এবং পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষ থেকেও হয়তো মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় সরকার ঘোষণার এই আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে

সম্ভবত সম্মতি ছিলো। অতএব, ১২ এপ্রিল আগরতলায় স্বাধীন বাংলার সরকার গঠনের কাজ সর্বসম্মতভাবে সমাধা করেও মেহেরপুরের মুক্তাঞ্চলে তা ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো কেবল একটা আনুষ্ঠানিকতার স্বার্থেই।

আগরতলায় স্বাধীন বাংলা সরকার গঠনের খবরটি শুধু সারা ভারতের সংবাদপত্রে নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রচারিত হয়। ত্রিপুরার 'দৈনিক সংবাদ' –এ ১৩ এপ্রিলের ব্যানার হেডলাইনটি ছিলো এ-রকমের "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে রক্ত ও অগ্নিশুদ্ধ স্বাধীন বাংলা সরকার ঘোষিত"। সাব-হেডলাইনটি ছিলো এরকমের "তাজউদ্দিন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্বে স্বাধীন বাংলার মন্ত্রিসভা যুগ্ম-যৌথ নেতৃত্ব। কুষ্টিয়ায় সদর দপ্তর স্থাপন স্বাধীন বাংলা বেতারের ঘোষণা বিশ্বে নজিরবিহীন ইতিহাস রচনা।"

'সংবাদ' -এর ১৩ এপ্রিলের খবরের সারাংশটি যেমনি আবেগময় ছিলো তেমনি গুরুত্বপূর্ণও। 'জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছে। একটি আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশিত বাঞ্ছিত ঘোষণা। শোণিত তর্পণে শুদ্ধ অগ্নিপুঞ্জ সরকার। জয় বাংলার জয়। জয় স্বাধীনতার জয়। মর্ত্যের জয় মানুষের জয়। বৃষ্টিস্নাত বাংলার আকাশ থেকে শোনা গেল আজ বারোই এপ্রিল সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঘোষণা। আবার শোনা যাবে ১৩ এপ্রিলের সকাল ৯টায়। স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে তার মন্ত্রিসভা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রনায়ক। তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী। কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গায় হবে স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দপ্তর (যদিও তা পরে মেহেরপুরে হয়েছিলো)। স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিসভার ঘোষিত নাম যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট), সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি (ভাইস প্রেসিডেন্ট), তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ (আসলে পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন)। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা হলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান। মন্ত্রিসভা পরিচালিত হবে গোটা নেতৃত্বে। আজ রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার শর্ট ওয়েভে (এফ) ৪১ মিটারে এই স্বাধীন সরকারের গঠন পর্বের ও মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষিত হয়েছে ।"

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানবেন সেই সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের সম্প্রচার হতো আগরতলা থেকে। চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাহসী কর্মীরা চলে আসেন কালুরঘাটে। ঢাকার বাসভবনে গ্রেফতারের ক্ষণকাল আগে শেখ মুজিব ওয়ারলেসে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে বাণীটি প্রেরণ করেছিলেন ২৬ মার্চ অপরাহ্ন পৌনে দুটোয় আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান কালুরঘাট বেতার

কেন্দ্র থেকে তা সম্প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাটি পরবর্তীকালে হ্যাণ্ডবিল আকারে মুদ্রিত হয়ে চট্টগ্রাম ও সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রামের ডাক্তার মনজুলা আনোয়ার হ্যাণ্ডবিলটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তবে এম. এ. হান্নানের পঠিত ঘোষণাটি দেশ জুড়ে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ খুব কম লোকই তা শুনতে পেরেছিল।

এ-ব্যাপারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান সংগঠকদের অন্যতম তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের নিজস্ব শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমার বিশ্বাস। এ ছাড়াও কেন্দ্রের অন্যান্য সংগঠক যেমন আবদুল কাসেম সন্দ্বীপ এবং আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বিভিন্ন সময়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বেলাল মোহাম্মদের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর ভাষায় "স্বভাবতই বিষয়টি আমার জানা ছিলো না। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান। তাঁকে আমি চিনতাম না। ২৬ মার্চ দুপুরে তিনি আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাছিরউদ্দিন এবং বেতার প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, দেলোয়ার হোসেন ও মোসলেম খানের প্রকৌশলী সাহায্য আদায় করেছিলেন। পাঁচ মিনিট স্থায়ী একটি বিক্ষিপ্ত অধিবেশন। ওতে তিনি নিজের নাম-পরিচয়সহ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ/প্রচার করেছিলেন।"

বেতার সম্প্রচারের ব্যাপারে এ-সময় একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগে একাধিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুদ্র ঘোষণাটি আবার প্রচার করা হয়েছিলো কালুরঘাট বেতার থেকে। এ পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, ডাক্তার আনোয়ার আলী, আবদুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, আশিকুল ইসলাম, দিলীপ চন্দ্র দাস ও কাজী হোসেন আরা। সেই সাথে কোরান তেলওয়াত ও ঐতিহাসিক একটি প্রার্থনা প্রচার করেন চট্টগ্রাম বেতারের সেই সময়কার বর্ষীয়ান গীতিকার কবি আবদুস সালাম।

সেই গা শিউরানো প্রার্থনা বোধ করি আজও অনেকের মর্মে গেঁথে আছে। সেটা ছিলো এই রকমের "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলাহিল করিম । আসসালামু আলায়কুম। প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের সাথে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এই গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কুরবানি দিচ্ছি, কোরান শরিফের ভাষায় তাঁরা মৃত নয়, অমর। দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি ... । নাসরুম মিনাল্লাহে ওয়াল ফাতহুন করিব। জয় বাংলা।"

২৭ মার্চ মেজর জিয়া "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে"

কালুরঘাট বেতার থেকে প্রথম ঘোষণা দেন এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে তা শেষ করেন। এরপর জিয়াউর রহমানের আরও দু'টি ঘোষণা এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র অর্থাৎ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে যথাক্রমে ২৮ এবং ৩০ মার্চ। দ্বিতীয় দিনে জিয়া সাহেব নিজেকে 'provisonal head of Bangladesh' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর ওই ঘোষণা একদিকে যেমন অরাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত ছিলো, অন্যদিকে তা ক্ষিপ্ত করেছিলো সেই সময়কার রাজনীতিবিদদের, বিশেষ করে চট্টগ্রামে অবস্থিত শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের। যাহোক, কালুরঘাটের ক্ষুদ্র বেতার যন্ত্রটি পাকিস্তানিদের বোমাবর্ষণের পরেও ই.পি.আর-এর সহায়তায় ওই কেন্দ্রের বিপ্লবী শব্দ সৈনিকরা বহন করে আগরতলায় নিয়ে এসেছিলেন।

জিয়া সাহেবের ঘোষণা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন

অফিস কক্ষে শুধু আমরা দু'জন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম আচ্ছা মেজর সাহেব, আমরা তো সব 'মাইনর'। আপনি 'মেজর' হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয় ! সাথে সাথে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন জিয়া এবং কাগজ–কলম নিয়ে বসে গিয়েছিলেন ঘোষণাটি লিখতে।"

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মেজর রফিকুল ইসলামের (যিনি পরবর্তীকালে ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কত্ব করেছিলেন) ওই ঘোষণা সংক্রান্ত বক্তব্যটি এ রকমের

২৬ মার্চ আমি টেলিফোনে জনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী ও এম. আর. সিদ্দিকী সাহেবকে অনুরোধ করে বলি চট্টগ্রামে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপারে ত্বরিত একটা বেতার ঘোষণা হওয়া দরকার। সে মতে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটা খসড়া তৈরি করে ফেলেন, যা ডাঃ জাফর শুদ্ধ করে দেন। ঘোষণাটির মূল বিষয়বস্তু ছিলো বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন। আবেদনটির বিষয়বস্তু হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে তাঁদের যা কিছু সম্ভব তা দিয়ে বাঙালিদের রক্ষা করা। তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম. এ. হান্নান ২৬ মার্চের বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে অর্থাৎ কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট বেতারযন্ত্র থেকে ঘোষণাটি পাঠ করেন। ১০ কিলোওয়াট এই যন্ত্রের শ্রবণ এলাকা ৬০ মাইলের বেশি নয় বলে দেশের বেশির ভাগ মানুষই তা শুনতে পায়নি। এই সীমাবদ্ধতার ফলে, ২৬ মার্চের হান্নান সাহেবের প্রথম ঘোষণা, ২৭ মার্চের মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং পরবর্তীকালে আরও অন্য ঘোষণাদি এলাকার বাইরে থেকে ভালোভাবে শোনা যায়নি।"

মেজর রফিক সম্প্রচারের সীমাবদ্ধতা এবং তৎকালীন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে শেষে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন এইভাবে এমন কি আমাদের হাতে যদি কোনো রেডিও স্টেশন নাও থাকতো, তাহলেও ইতিহাসের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হতো না। সারাদেশের মানুষ তখন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে

যাচ্ছিল। চট্টগ্রামের ২৫ মার্চের রাত ৮টা ৩০ মিঃ আমরা যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। পাকিস্তানিরা সে রাতের ৮টা ৪৫ মিনিটে 'অপারেশন জেনোসাইড' শুরু করেছিলো এবং সে রাতেই দেশের অন্যান্য স্থানে শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিলো।"

আগরতলায় ১২ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন সংক্রান্ত নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত এবং ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলো ত্রিপুরার সে সময়কার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'সমাচার'। আগরতলা ডেটলাইনে সাপ্তাহিকীটির ১৮ এপ্রিল সংখ্যার মন্তব্য ভাষ্য ছিলো এ-রকমের "এশিয়ার ইতিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো : প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্মলগ্নে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শাসনতন্ত্রের মৌলিক লক্ষ্যের উদ্রেক।"

সচেতন পাঠক মাত্রেই অনুধাবন করবেন যে, 'দৈনিক সংবাদ' এবং 'সাপ্তাহিক সমাচার' এই দুটো কাগজের সংবাদ উপস্থাপনে যে ভাষা এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো, তা সেই সময়কার সামরিক নির্যাতনে পিষ্ট আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধার মনোবল ফিরিয়ে আনতে কতোখানি সাহায্য করেছিলো।

'সমাচার'-এর ১৮ এপ্রিলের মূল খবর ছিলো এই রকমের "আগরতলা 'বাংলাদেশ'-এর গ্রাম-শহর জুড়ে যখন হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহতভাবে চলছে একদিকে, অন্যদিকে এরই মধ্যে ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভাসহ স্বাধীন বাংলা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। শেখ মুজিবুর রহমান এই নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীরূপে ঘোষিত হয়েছেন।"

স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির উদ্দেশে প্রচারিত প্রথম বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সেদিন বলেছিলেন "যতদিন চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আকাশে থাকবে ততদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্যও অম্লান থাকবে।" প্রধানমন্ত্রী আহমেদ তাঁর ওই বেতার ভাষণে আরো বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দকে যে বাংলাদেশ তাদের জাতীয় জীবনের মুক্তির দিশারীরূপে মেনে নিয়েছে, এমন কোনো দুর্দৈব বা এমন কোনো শক্তি নেই যা এই বাংলার স্বাধীনতার স্পৃহাকে পরাভূত করতে পারে। এক বিশেষ উৎসবে এই নতুন সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়। নতুন মন্ত্রিসভা হাজার হাজার উদ্বেলিত মানুষের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উৎসবের বিবরণ সংগ্রহ করেন। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের খসড়াও সম্পূর্ণ। নতুন শাসনতন্ত্রে শোষণ বিমুক্ত শ্রেণীহীন ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে।"

এই অস্থায়ী বা বিপ্লবী সরকার তখন থেকেই ‘মুজিবনগর সরকার’ নামে পরিচিত হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি কাজকর্ম, রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রশাসনিক—সবকিছুই ‘মুজিবনগর সরকার’ নামে পরিচিত। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকলেও তাঁর নাম নিয়ে ও তাঁকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম। নেপথ্যচারী হলেও শেখ মুজিব রয়ে যান কোটি কোটি দেশবাসীর হৃদয়ের মর্মে। ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা, এই ঠিকানায় অবশেষে স্থাপিত হয় মুজিবনগর সরকারের প্রধান দপ্তর।

ডেটলাইন আগরতলা

ইয়াহিয়া টিক্কা খানের গণহত্যার নীল নক্‌শা সংক্রান্ত খবর যাতে কোনোমতেই বাইরে প্রচার না হয়, তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সব ধরনের গোপনীয়তা রক্ষায় বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। কিন্তু তারপরও বিশ্বের কাছে অজানা থাকেনি তাদের পরিচালিত নিষ্ঠুর নরমেধযজ্ঞের কাহিনী। সাইমন ড্রিং তখন লণ্ডন ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর রিপোর্টার। মার্চের ৬ তারিখ তিনি ঢাকা পৌছান। উত্তাল গণবিদ্রোহ তখন ঢাকাসহ সারা দেশে। তার চোখের সামনে দিয়ে বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে তখন দ্রুত। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চের রাত থেকে নির্বিচারে গণহত্যা আর ঢাকা শহরে বর্বর সেনাবাহিনীর উন্মত্ততা সব দেখেছেন তিনি।

ঢাকায় তখন প্রচুর বিদেশী সাংবাদিক। প্রথম সুযোগেই প্রত্যেক বিদেশী সাংবাদিককে রাইফেলের মুখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জড়ো করেছিলো পাকবাহিনী এবং এক অর্থে তাদের বস্তাবন্দী করেই যেনো সোজা করাচি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ২৬ বছরের সাইমন ড্রিং হোটেলের ছাদে লুকিয়ে থেকে মিলিটারিদের হাত থেকে রক্ষা পান এবং এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন পলাতক ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্টির সাথে তিনি বিধ্বস্ত ঢাকা শহর গোপনে ঘুরে দেখেন। তারপর জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ড্রিং ব্যাংককে পাড়ি জমান। এই তরুণ বৃটিশ সংবাদদাতার রিপোর্ট ৩০ মার্চ, ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এ ছাপা হয়—যার সূচনা পর্বটি ছিলো এ-রকমের "আল্লাহ এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকাকে পিষে মেরেছে, ভয়ার্ত এক নগরীতে রূপান্তরিত করেছে।" ড্রিং-এর প্রতিবেদনটি ছিলো পাকিস্তানি গণহত্যার ওপর প্রথম বিস্তারিত রিপোর্ট।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ছিলো এক অর্থে বাংলাদেশের ডেটলাইন। শ'শ'

বিদেশী সাংবাদিক এসে ভিড় করেছিলেন আগরতলায়। আগরতলা ডেটলাইনে ছাপা হয়েছে দীর্ঘ আট/সাড়ে আট মাস ধরে বাংলাদেশের ভেতরকার অবস্থাদির খবরাখবর। বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকদের ভিড় ছিলো আগরতলায় সীমাহীন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সংবাদদাতা ছিলেন মধুসূদন গুহ রায়, আকাশবাণী থেকে ছিলেন সনৎ মুখার্জি, যুগান্তর থেকে অনিল ভট্টাচার্য (সিনিয়র) এবং অন্যজন আগরতলাবাসী অনিল ভট্টাচার্য [যার কথা আগেই বলেছি], স্টেটস্‌ম্যান থেকে অমূল্য গাঙ্গুলী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, মনোজিৎ মিত্র, আনন্দবাজার থেকে অসীম দেব রায়, তুষার পণ্ডিত, টাইম অব ইণ্ডিয়া থেকে সুভাষ চক্রবর্তী ও কীরিট ভৌমিক, ইউএনআই থেকে কে. কে. চাড্ডা ও চৌধুরী। আরও অসংখ্য ভারতীয় সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের রিপোর্ট করেছেন আগরতলায় এসে। এদের কেউই এক নাগাড়ে আগরতলায় না থাকলেও প্রয়োজনে কলকাতা ও দিল্লি গেছেন। আবার ফিরে এসেছেন এই আগরতলাতেই।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রক্রিয়ায় আগরতলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ভূপেন দত্ত ভৌমিক সম্পাদিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত টেবলয়েড সাইজের এই দৈনিকের শতকরা নব্বুই ভাগ খবর ছিলো বাংলাদেশ সংক্রান্ত। সাপ্তাহিকীগুলোর ভেতরে অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সমাচার'-এর ভূমিকাও ছিলো উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক কেবল নিজেই নন, সেইসাথে তার কাগজটিও সব অর্থেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। দৈনিকের মধ্যে 'জাগরণ' এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' ও বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

স্বদেশ থেকে বিতাড়িত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক ভাইয়েরাও একাধিক কাগজ প্রকাশ করেছিলেন আগরতলা থেকে। এগুলোর কোনোটিই নিয়মিত প্রকাশ পায়নি এবং সঙ্গত কারণেই প্রকাশের স্থান আগরতলা হলেও সেগুলোর মুদ্রণ সংক্রান্ত পরিচিতিতে 'মুজিবনগর'-এর উল্লেখ থাকতো। এমনি অনিয়মিত কাগজগুলোর ভেতরে উল্লেখযোগ্য সিদ্দিকুর রহমান আশরাফী সম্পাদিত ও রন্ধিনা প্রকাশনীর পক্ষে পলাশ আর্ট প্রেস, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত 'বাংলার মুখ'। এমনি আরো কিছু পত্রিকা, যা আমি হস্তগত করতে পেরেছি, তার মধ্যে রয়েছে 'সন্দ্বীপ থেকে ধলেশ্বরী', 'স্বাধীনতা' এবং 'জয়বাংলা।' এসব কাগজের সব ক'টিই প্রচারধর্মী এবং মুক্তিফৌজ ও শরণার্থীদের মনোবল দৃঢ় করার অভিযানী লক্ষ্যে নিবেদিত। টেবলয়েড সাইজের এইসব সাপ্তাহিক ও অর্ধ-সাপ্তাহিক ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে এবং মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ক্যাম্পে তখন বিতরণ করা হতো।

কলকাতার দু'জন সাংবাদিক আগরতলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে।। যদ্দূর জানা যায়, এই দু'জনের

আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি পরে। ধারণা করা হয়, পাকিস্তানিদের হাতে ওই দুই সাহসী ভারতীয় সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করেন। একজনের নাম সুরজিৎ ঘোষাল (আনন্দবাজার) ও অন্যজন দীপক ব্যানার্জি (অমৃত বাজার)। তাঁদের মতো আর কোনো ভারতীয় সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আগরতলা থেকে ঢাকা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোর খবরাখবর সংগ্রহ যতো সহজ ছিলো, অন্য কোনো ভারতীয় শহর থেকে ততোটা নয়। আগরতলা সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ডেটলাইন হতে পেরেছিলো। ঢাকাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নিত্যদিনের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ সেদিনই পেয়ে যেতেন আগরতলায় বসা সাংবাদিক বন্ধুরা। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা নিয়মিত লিখেছেন আগরতলাকেন্দ্রিক এইসব পত্রপত্রিকায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সত্যিকার নাম তাঁরা গোপন রাখতেন নিরাপত্তার স্বার্থেই। তবে কেউ কেউ স্বনামেই লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আবদুল গাফফার চৌধুরী ও সন্তোষগুপ্ত অন্যতম। অধিকাংশই তাঁদের নাম প্রকাশ করেননি। দেশের ভেতরে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার বেড়ে যেতে পারে এই সমূহ আশঙ্কা থেকে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগতলায় আসেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তখন প্রচারণা চালাচ্ছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সাপ্তাহিক 'সমাচার' জনাব চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার ছাপে জুলাই মাসের ৬ তারিখের সংখ্যায়। জনাব চৌধুরীর ওই সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানিদের ওপরে উল্লিখিত দাবিকে 'সম্পূর্ণ অসত্য' বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেছিলেন "ঢাকায় কার্যত মধ্যরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকলেও রাস্তাঘাট অপরাহ্ণ তিনটার আগেই একেবারে শূন্য হয়ে যায়। প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র মতিঝিল, নিউ মার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের শতকরা ২০ ভাগ দোকানপাটও এখনো খোলা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের নারকীয় অত্যাচারের বিবরণ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর এবং কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ঢাকা শহর ঘুরে যাওয়ার পর সরকারের প্রকাশ্য অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোপন অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে। ১ জুন রাতে শহরের আরামবাগ এলাকার একটি গৃহে হানা দিয়ে একটি সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের ওপর অত্যাচার চালানো হয় এবং বাড়িতে বোমা রয়েছে এই অজুহাতে পরিবারের বয়স্ক সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকার তেজগাঁ এলাকায় অবস্থিত বেগম হাকাম পরিচালিত একটি অনাথ আশ্রমে পাকিস্তানি সৈন্যরা হানা দিয়ে আশ্রিতা মেয়েদের ওপর

পাশবিক অত্যাচার চালায়। এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিকারের জন্য সাক্ষাৎ করলে তারা অবজ্ঞার সাথে জানায়—কোনো দেশে সামরিক তৎপরতা চলাকালে এই ধরনের ঘটনা হয়েই থাকে। যাহোক, তারা এ ব্যাপারে তরুণ পাঞ্জাবী অফিসারদের জানিয়ে দেবেন তারা যেন ধর্ষিতা মেয়েদের কিছু কিছু টাকাকড়ি দেয়।"

গাফফার চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকে জুন-জুলাই মাসে ঢাকা শহরের সত্যিকার অবস্থারও কিছুটা আঁচ করা যায়। তার বিবরণ ছিলো এ-রকমের " ঢাকা শহরে পাঞ্জাবী সৈন্যদের টহলদান, বিশেষ বিশেষ এলাকায় অগ্নিসংযোগ, রাজপথ থেকে আকস্মিকভাবে বেছে বেছে কিশোর ও তরুণদের গ্রেফতার করা এবং অভিজাতপাড়া থেকে বাঙালি নারী হরণ অব্যাহত রয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকার নারিন্দা রোডের রমজান আলী নামে এক মিউনিসিপাল কন্ট্রাকটরের ঘরে একজন পাঞ্জাবী সৈন্য হানা দেয়। তার যুবতী স্ত্রী রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলো। সৈন্যরা বলে, রমজান আলী আওয়ামী লীগের সদস্য—তাকে গ্রেফতার করবো। ভীতসন্ত্রস্ত স্ত্রী জানায়, ওর স্বামী ঘরে নেই। এরপর সৈন্যরা জোরপূর্বক রমজান আলীর গর্ভবতী স্ত্রীর ওপর প্রকাশ্যভাবে পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে ঘরের রেডিও, টেলিভিশন, অলঙ্কার, নগদ টাকা সব লুট করে নিয়ে যায়। রমজান আলীর গর্ভবতী স্ত্রী পরদিন বেলা দশটায় মারা যায়।" গাফফার চৌধুরীর ওই সাক্ষাৎকার থেকে পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী নিধনের পাকিস্তানী প্রস্তুতির ব্যাপারটাও চোখে পড়ে। " গত ১ জুন ঢাকার ইংরেজি ও বাংলা সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিকের মালিক ও সম্পাদকের কাছে এক সার্কুলার পাঠিয়ে উক্ত পত্রিকাগুলোতে কর্মরত একদল বাছাই করা সাংবাদিকের রাজনৈতিক মতামত ও অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে সাংবাদিক মহলে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার-ঘেঁষা ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' -এর কয়েকজন বাঙালি সাংবাদিক পর্যন্ত সম্ভাব্য নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।"

রাজ্য সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকারের একটি বিজ্ঞাপন আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে আগরতলার পত্রপত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হতে শুরু করে। মুক্তহস্তে রাজ্যবাসীর প্রতি সরকারি তহবিলে দান করার এই আহ্বানসম্বলিত বিজ্ঞাপনটি শরণার্থীদের নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের দুশ্চিন্তাকেই প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞাপনটি ছিলো এ-রকমের "১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ ৫৬ হাজার। উপরন্তু ১১ লক্ষেরও বেশি শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন। এখনো শরণার্থীরা অনবরত ত্রিপুরায় আসছেন। সারা দেশ থেকে ত্রিপুরা প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা চলে। কেবল উত্তর দিকে আসামের সঙ্গে স্থলপথে

এই রাজ্যের যোগাযোগ আছে। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সঙ্গে সড়কপথে বাইরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘোরালো ও অসুবিধাজনক। তাই প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর অধিকাংশ আকাশপথে পরিবহন করতে হয়। এই দূরবর্তী ও অসুবিধাজনক অঞ্চলে আগত এক অস্বাভাবিকসংখ্যক শরণার্থীর ত্রাণ ব্যবস্থা করতে হলে প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। আপনাদের ক্ষুদ্র দানই আমাদের শক্তির বিরাট উৎস। মুক্তহস্তে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় রেডক্রসের ত্রিপুরা শাখা সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।"

'দৈনিক সংবাদ' 'বাংলাদেশ—মাটি ও মানুষ' শিরোনামে একবার নয়, একাধিকবার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এইসব সংখ্যায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা, নির্যাতন আর স্বাধীন বাংলার নব-উত্থানকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছিলেন লেখক বিপুল মজুমদার, অনির্বান দত্ত, অগ্নিমিত্র, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ। এ জাতীয় বিশেষ ধারাবাহিক সংখ্যার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাও করলেন সম্পাদক এই বলে 'বাংলাদেশ—মাটি ও মানুষ' এই বিষয়ের ওপর আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য পদ্মা, মেঘনা পারের যে জীবন এতোদিন নাচতো ধানের ক্ষেতে, বাতাসের দোলায়িত ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, গহীন নদীর স্রোতের মতো যার ছিলো একটানা গতি, কাঁচা ধান আর পাটের সোঁদা গন্ধ বুক ভরে নিয়ে যে জীবন ছিলো শত দুঃখের আর দারিদ্র্যের মধ্যেও পথের পাশে ফুটে ওঠা ঘেটু ফুলের মতো তাজা সেই জীবনের ছন্দ, রূপ আর গতি কি করে পাল্টে গেলো, কি করে ওদের কোমল বুকের মৃদু ধুকধুকানিতে শব্দ জেগে উঠলো, সারী, জারী আর মুর্শেদী গানে যে শ্রবণ উৎকর্ণ হতো সে কান আজ গুলির শব্দে আর পাখি পড়ার শব্দে কেনো এতো সতর্ক, মসজিদে আজান আর মন্দিরের সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টায় যে জীবন বন্দনা করতো মানুষের কল্যাণকে সে আজ কেনো খেলছে রক্তের হোলি উৎসব !
বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম জীবনের সংগ্রাম, সংস্কৃতির সংগ্রাম এক হয়ে গেছে। বাংলাদেশ—মাটি ও মানুষ তারই একটা ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।"

মুক্তিযুদ্ধে আগরতলাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নিতে গিয়ে ত্রিপুরার সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত পর্যায়সহ প্রায় প্রতিটি সূত্রেই হানা দিয়েছি আমি। সম্পাদক এবং 'দৈনিক সংবাদ'-এর স্বত্বাধিকারী ভূপেন দত্ত ভৌমিকের সাথে কথা বলার সময় তাঁকে ক্ষণেকের জন্যে হারিয়ে যেতে দেখেছি বিশ বছর আগেকার আগরতলায়। শুধু তাঁর কাগজ নয়, ব্যক্তিগতভাবেও অসংখ্য সম্পাদকীয়, খবর এবং নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখেছিলেন তখন ভূপেন বাবু। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের ওপর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখেন তিনি। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো "মেজর খালেদ মোশাররফ ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের

একজন অফিসার। মেজর শাফায়াত জামিল তাঁরই সহকর্মী। খালেদ মোশাররফ আজ একটি নাম। কুমিল্লা থেকে আসাম-সিলেট সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' মাইলের মত আজ মেজর মোশাররফ, তাঁর সহকর্মীদের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিফৌজের আয়ত্তাধীন। আজ মেজর খালেদ মোশাররফ আর মেজর শাফায়াতের সঙ্গে তাঁদের সদর দপ্তরে কথা হচ্ছিল। সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে আগত ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়ার (ইউএনআই) প্রতিনিধি শ্রী কে. কে. চাড্ডা। মেজর মোশাররফকে আমি প্রথম দেখেছিলাম গত ২৯শে মার্চ। সেদিন মেজর অনেকাংশেই বিব্রত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। খররৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নের মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিন আবেগমথিত কণ্ঠে সৌখিন খালেদ প্রশ্ন করেছিলেন—"পৃথিবীতে সভ্যতা কি ধ্বংস হয়ে গেছে ? মানবাধিকারের ঘোষণা কি শুধু কথার মালা ? বাংলার কোটি কোটি মানুষ কি অন্যায় করেছিলো ? দাসত্ব থেকে মুক্তি চাওয়া কি অন্যায় ? হিটলারের নাজী বাহিনীকে মানুষ ধিক্কার দেয়। কিন্তু বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে খুন, সম্পদ নাশ, বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার ঘটনাকে কেন বিশ্বের মানুষ আজ ধিক্কার দেয় না ?"

"৩ এপ্রিলের ঘনায়মান সন্ধ্যায় সীমান্ত প্রান্তে দাঁড়িয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম মেজরকে। সিলেটের চা বাগানের পথ ধরে আমাদের জীপ এগিয়ে চলল। বাংলাদেশের গাঢ় সবুজ রং-এর জাতীয় পতাকার মধ্যে রোদের রক্ত আভা যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ যেন ঠিক সবুজ বাংলার হৃৎপিণ্ড। মেজর খালেদ—বয়স কত ? সাকুল্যে ৩৩। মেজর শায়ায়েত—এই ৩১-এ পা দিয়েছে। উভয়েই দু'টি সন্তানের জনক। ঢাকায় পরিবার। স্ত্রী, পুত্রকন্যার খবর কেউ জানেন না। বেঁচে নেই—এটাই ধরে নিয়েছেন। হালকা বাদামি রঙের শার্ট গায়ে মেজর মোশাররফ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আরে ? কেমন আছেন ? কণ্ঠে যেন কতদিনের আত্মীয়তার সুর। মোশাররফ এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক। ওর মধ্যে এমন আশ্চর্য গুণ আছে যা অন্যকে সহজে অভিভূত করে। চোখেমুখে স্পষ্টই ক্লান্তির ছাপ। নিদ্রাহীনতায়, পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায়—সবকিছুর মধ্যেও তাঁর চোখ দু'টিতে অদ্ভুত এক মায়াময় স্বপ্ন। স্বাধীনতার মগ্ন চেতনায় ওর আয়ত চোখ দু'টি গভীর।"

১৯৭১-এর ৩১ মার্চ, ভারতীয় সংসদের উভয় সভায় সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের ওপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৫ মার্চ থেকে সারা পূর্ব বাংলায় গণহত্যা, পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর নিষ্ঠুরতা, গণরায়ের প্রতি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার অবজ্ঞা—ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া ছিলো ভারতীয় সংসদের সেই সর্বসম্মত প্রস্তাবে। প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপ

"বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এই সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠ রোধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছে। নির্লজ্জভাবে সেনাবাহিনীর রাইফেল, বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, কামান ও সামরিক বিমান ব্যবহার করে পূর্ব বাংলার মানুষের শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

"আমাদের সীমান্তের এত নিকটে সংগঠিত এই মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এই সংসদ নীরব থাকতে পারে না। একটি নিরস্ত্র ও নিরীহ জাতির ওপর যে ব্যাপকভাবে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে আমাদের দেশের জনগণ এর তীব্র নিন্দায় ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।"

"গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার মানুষের এই সংগ্রামের প্রতি এই সংসদ আন্তরিক সহানুভূতি ও একাত্মতা জ্ঞাপন করছে।"

"এই সংসদ অবিলম্বে অসামরিক জনতার ওপর থেকে এই বলপ্রয়োগ ও অত্যাচার অবসানের দাবি জানাচ্ছে। গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই সংসদ বিশ্বের সমস্ত জাতি ও সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

"এই সংসদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক জাগরণ জয়যুক্ত হবেই। তাঁদেরকে এই সংসদ এই আশ্বাস দিতে চায় যে, তাঁদের সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের প্রতি ভারতবাসীর গভীর সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন থাকবে।"

সাপ্তাহিক 'সমাচার' অত্যন্ত সাহসী আর প্রতিবাদী সম্পাদকীয় ছেপে গেছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে। ১৯৭১-এর ২০ জুন, 'সমাচার'-এর সম্পাদকীয়টি এক অর্থে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেই লেখা। সেখানে বলা হয়েছিলো

"ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর আক্রমণের প্রায় তিন মাস অতিক্রম হতে চললো। বিশ্বের ঘুমন্ত বিবেক এখনো তার ঘুমের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠে দেখতে পারছে না, কেননা স্বার্থের ভাইরাসে তাদের চোখগুলো চিরদিনের মত আক্রান্ত হয়েছে।

গত তিন মাসে সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে, পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে আসছেন মানুষ। কি তাঁরা চান ? কেন তাঁরা এলেন ? কি তাদের দোষ ? এই প্রশ্ন কি বিশ্বের ক্ষমতাবান নেতৃবৃন্দ ঐ তথাকথিত পাকিস্তানের জেনারেল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে জিগ্যেস করেছেন ? এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কার ? যদি এককভাবে ভারতবর্ষের হয়ে থাকে, পৃথিবীর নেতৃবৃন্দ যদি তা মনে করেন, তবে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি কথার গুরুত্ব দিচ্ছেন যে, একজন শরণার্থীকেও ভারতে থাকতে দেয়া হবে না। কিন্তু থাকতে দেয়া হবে না'র অর্থ কি জোর করে তাঁদের তাড়িয়ে দেয়া, অথবা

সেই নেকড়ের মুখেই তাঁদের ছেড়ে দেয়া ? যদি তাই না হয়, তা'হলে সেই ক্ষুধার্ত নেকড়েকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়নের কোন পথ ভারত সরকার কি গ্রহণ করেছেন ? সেই নেকড়েও বাংলাদেশে থাকবে, শরণার্থীরাও ফিরে যাবেন—এমন ভাবনা-চিন্তার প্রশ্রয় যদি কেন্দ্রীয় সরকার তার মনে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন তবে ভারতব্যাপী তার অশুভ ফলের জন্য তৈরি থাকতে হবে।"

কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগরতলার প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি সংবাদপত্র অভাবিত ভূমিকা রাখে। সেই সাথে ভূমিকা রাখে সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের বিরোধী দলগুলো। ২৫ জুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম আগরতলায় এক জনসভায় ভাষণ দেন। শ্রীরাম দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হবেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যরা পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম আর দমাতে পারবে না। এখন যদিও শরণার্থীদের আগমন বন্ধ হয়নি—তবে বয়োবৃদ্ধ এই নেতার ভাষায়, এই শরণার্থীরা একদিন ফিরে যাবে, তবে যাবে তাঁরা শেখ মুজিবের বাংলায়—ইয়াহিয়ার পূর্ব পাকিস্তানে কখনো নয়। শ্রীরামের এই জনসভায় বাংলাদেশের হাজার হাজার শরণার্থী যোগদান করেছিলেন।

নভেম্বর মাসের দিকে হানাদার সেনাবাহিনী সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে। শরণার্থী ও মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার অপরাধে ভারতকে পাকবাহিনী সম্ভবত একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়। সে সময়ে ত্রিপুরার সংবাদপত্র, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কাগজ এবং বিশ্বের অনেক সংবাদপত্র পাকিস্তান সরকারের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের কথা ফলাও করে প্রচার করে। তিনদিক থেকে পাক ফৌজ পরিবেষ্টিত হয়ে এ-সময় বিনা প্ররোচনায় গোলাগুলির যন্ত্রণায় গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার মানুষ। এই পরিস্থিতির সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়র পর সম্পাদকীয়তে। এই রকম একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো "যুদ্ধের আশঙ্কায় ত্রিপুরাবাসীমাত্রই চিন্তিত। চিন্তার কারণ হচ্ছে কেবল আমরাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পাক-কামান বিমানের গোলার মুখোমুখি। আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তর ও অসামরিক প্রতিরক্ষা রাজ্যবাসীর জানমাল রক্ষায় যথাসাধ্য প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও সাধারণ মানুষের মন ক্রমশই ভয়ের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। জনসাধারণের এই ভয় থেকে পরিত্রাণ নেই। আর গৃহহীন হয়ে দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয়ই কি একমাত্র পরিত্রাণ? আগ্নেয় মারণাস্ত্রের পরিধি গোটা ত্রিপুরাকেই কোলে করে বসে আছে। বিনা নোটিশেই তা কার্যকর হতে পারে যেকোনো মুহূর্তে।"

রাজ্যবাসীদের যখন এমন আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা তখন ত্রিপুরার লেঃ গভর্নর এ এল. ডায়াস রাজ্যবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ দেন। ভাষণের প্রথমেই তিনি যারা সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে এবং অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে,

সেই শরণার্থীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এই বলে "পূর্ব বাংলার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভাবাবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে—এটাই স্বাভাবিক। তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কোন অবস্থাতেই অস্থির হওয়া চলবে না। ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর লোক দুর্গত উদ্বাস্তুদের দুর্দশা লাঘবে স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত হয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং সেবার কাজ করে চলেছেন, নগদ অর্থ কিংবা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করছেন—তার জন্য আমি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। স্কুল-কলেজের বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে আমরা যে সাড়া পেয়েছি তাতে আমি আভিভূত হয়েছি। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়দান ও খাদ্য সরবরাহের জন্য ইতোমধ্যেই দু'শ'র ওপর অস্থায়ী শিবির খোলা হয়েছে, এগুলোর অধিকাংশই খোলা হয়েছে বিদ্যালয় গৃহে।" মিঃ ডায়াসের এই ভাষণটি প্রচারিত হয়েছিলো ১৯৭১-এর ৮ মে।

নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের কাছ থেকে শরণার্থী সংক্রান্ত যে সর্বশেষ হিসেবটি পাওয়া গেছে, তার থেকে দেখা যায়, শিবিরে আশ্রিত কিংবা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল এমন মোট ৯৫৮৭৮৯৭ জন শরণার্থী ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। নভেম্বর মাসেও দৈনিক গড়ে ১৫৫০০০ মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করত। ২৭-১০-৭১ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা ছিলো ৭২২৯১৪৪ জন, ২৫-১০-৯১ পর্যন্ত আসামে ছিলো ২৯৫০৯০ জন, ২২-১০-৭১ পর্যন্ত মেঘালয়ে ছিলো ৬৪৬৯৬৫ জন, ২৫-১০-৭১ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ছিলো ১৪০৭৪১৬ জন এবং ২১-১০-৭১ পর্যন্ত বিহারে এই সংখ্যা ছিলো ৯২৮২ জন। অতিরিক্ত চাপের কারণে ভারত সরকারের উদ্যোগে বিহারেও কিছুসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিলো।

নভেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রস্তাবিত সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ১১০,৪৪৮,৯০১ ডলার, সরাসরি ভারত সরকারের কাছে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ৪৮,৭৮৪,৩৪৩ ডলার এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেয় এই পরিমাণ ছিলো ২৫৩,৬৮৫ ডলার। জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ প্রদত্ত প্রস্তাবিত সাহায্যের পরিমাণ ছিলো এ-রকমের, যেমন —এফ.এ.ও ডাব্লুউ. ই.পি —৬,১০০,০০০ ডলার, ইউ.এন.এইচ.সি.আর—৫০০,০০০ ডলার, ইউ.এন.আই.সি.ই.এফ —৬০০,০০০ এবং ডাব্লুউ.এইচ.ও—১৫৫,০০০।

শরণার্থীদের জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র ভারত সরকারের কাছে নগদ অর্থ ও দ্রব্যাদিও সাহায্য হিসেবে দিয়েছিলো। টাকায় সেই অঙ্কের হিসেব এ রকমের সোভিয়েত ইউনিয়ন—৩,৪৮,০০,০০০, যুক্তরাজ্য—২,৫০,৫৮,৩৭৬, জাপান—১,১৬,৩৯,২০৩, অস্ট্রেলিয়া—৩৪,৭২,৮৪৩, পশ্চিম জার্মানি—৩১,৪৭,৩৩০,

হংকং—৯,৪৬,০০০, হল্যাণ্ড—৪,৩৯,০৭৬, পূর্ব জার্মানি—২,২৯,৩০০, যুগোস্লাভিয়া—১৪,৩২৫, সিঙ্গাপুর—৯,৫২৫, অন্যান্য রাষ্ট্র—১,৫৪,১৯২, ইউনিসেফ [জাতিসংঘের মাধ্যমে]—৫,৭৯,৩৯,৪৬০, চেকোস্লোভাকিয়া—৫,০০,০০০, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশন—৮,১৯,৫১,৮৫৫, অস্ট্রেলিয়ার 'মুক্তি অভিযান সংস্থা' নামের একটি সংগঠন—৫,৮৪,০০০ এবং বিভিন্ন দেশের ওষুধপত্র—১,২৭,৮৬,২৬৩। দ্রব্যসহ নগদ মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিলো ২৩,৩৬,৭১,৪৫১।

পাকিস্তানি কামানের লক্ষ্যবস্তু

ত্রিপুরার মাটিতে পাকিস্তানি নাশকতামূলক তৎপরতা সেই এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত চলেছে। ভারতের আর কোনো রাজ্য পাকিস্তানিদের এমন প্রত্যক্ষ আক্রমণের এতোখানি শিকার হয়নি। ত্রিপুরার সড়কে পাকিস্তানিদের পোঁতা মাইন যেমন অবিরল ফুটেছে, তেমনি রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে রাজ্যের মানুষ ও মাটি তাদের কামানের গোলার আঘাতে।

১৫ মে মধ্যরাত থেকে শুরু করে পাকিস্তানিরা ভোর পর্যন্ত আগরতলার সীমান্ত লক্ষ্য করে বেপরোয়া গোলাবর্ষণ করে। গোলার আঘাতে দু'জন ভারতীয় প্রাণ হারান এবং উনিশজন বুলেটবিদ্ধ হয়ে আগরতলার জি.বি. হাসপাতালে ভর্তি হন। আগরতলার পত্রিকাগুলোর ভাষায়, "এপ্রিল থেকে অব্যাহত পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে আগরতলার সীমান্ত গ্রামগুলোর বাসিন্দারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রাতের অন্ধকারে ছুটাছুটি শুরু করে।" একই দিন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় ২৯৭ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে ছিলেন ২১১ জন দেশত্যাগী শরণার্থী নারী-পুরুষ এবং বাদবাকিরা ত্রিপুরাবাসী।

স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ধরে যে ভূমিকা রাখে তাতে করে ওগুলোকে বাংলাদেশের পত্রিকা ছাড়া আর কিছুই যেনো ভাবা যায় না। অধিকাংশ কাগজ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার খবরই শুধু ছাপেনি, সেই সাথে বাংলাদেশ ও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সপক্ষে সবধরনের প্রচার চালিয়েছে "গুপ্তচরদের সম্পর্কে সাবধান থাকুন" এমনি ধরনের খবরের শিরোনাম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বরাত দিয়ে। আর সেখানে বলা হয়েছে, " শরণার্থীদের ছদ্মবেশে যে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তি এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে তাদের সম্পর্কে

আমাদের জনসাধারণ সতর্ক থাকবেন। যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য পেলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়ি অথবা থানায় দেয়া অবশ্য কর্তব্য।"

প্রশাসনের তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কতা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। ত্রিপুরার মাটিতে সে সময়ে পাকিস্তানি চরদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা প্রায় প্রতিদিনই চলতে থাকে। পাক সেনাবাহিনী আন্তঃদেশীয় সীমান্ত আইন লংঘন করে বারবার ত্রিপুরার মাটিতে হানা দেয়। ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা আগরতলা থেকে দেড় মাইল দূরে অরুন্ধতী নগরের উপকণ্ঠে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গ্রেনেড ছোঁড়ে। নিকট পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে সীমান্তের ওপার থেকে তা নিক্ষেপ করা হয়। ৩০ মে কর্নেলবাজার এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত তিন ইঞ্চি মর্টারের তিনটি গোলা বেলাবর গ্রামে এসে পড়ে। এর আগের রাত্রে হানাদার বাহিনী বিশালগড় সীমান্তের কাছে গোলাবর্ষণ করে এবং তাদের মর্টারের ৫টি গোলা ভারতের দেবীপুর বর্ডার পোস্টের কাছে এসে পড়ে। ২৪ মে বেলা ১০টায় প্রায় ত্রিশজন পাকিস্তানি সৈন্য খোয়াই পুলিশ স্টেশনের সাবেহপুর গ্রামের ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশ করে। ২৫ মে বিকেল পৌনে ৪ টায় পাকিস্তানিরা সোনামুড়া সীমান্ত এলাকায় মাঝারি পাল্লার মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ে। এর ফলে ত্রিপুরার কুলুবাড়িতে অনেকেই বুলেট বিদ্ধ হন।

যুদ্ধ যখন চলছে, তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত মুক্তিফৌজ এবং শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকায়, পাকিস্তানিদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত এমন বাঙালি গুপ্তচরদের তৎপরতা যথেষ্ট মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আগরতলার একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র ওই সময় এ নিয়ে শক্ত ভাষায় সম্পাদকীয় লিখেছিলো। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলো "গুপ্তচরদের স্যাঙাতদের গরদে পুরে দাও"। সম্পাদকীয়টির বিষয়বস্তু ছিলো এ-রকমের " পাকবাহিনীর জাল বহুদূর বিস্তৃত। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যেও অনুচরতো আছে। আছে তারা বহাল তবিয়তে।

একথা সত্য, স্রোত ধারায় শরণার্থীদের আগমন হয়েছে তার মধ্যে ভেদ বিচার করা অনেক সময়ই সম্ভব নয় ।"

১১ আগস্ট বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধর্মনগর মহকুমার রানিবাড়ি বিওপি লক্ষ্য করে পরপর দুটো কামানের গোলা নিক্ষপ করে। এতে দু'জন আহত হন। এর আগের দিন বিলোনিয়ার পুরান রাজবাড়ি থানার রাঙামুড়ায় দখলদার সৈন্যরা হঠাৎ করে গোলাবর্ষণ শুরু করলে তিনশ' শরণার্থী গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের অনেকে পরে মৃত্যুবরণ করে। জুলাই মাসের ২৫ তারিখে পাকিস্তানি সশস্ত্র কমাণ্ডোদের ৯ সদস্যের একটি দলকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও গ্রামবাসীরা ধরে ফেলে। এই দলটি আগরতলা বিমানবন্দর,

সেতু, সিনেমা ও পত্রিকা অফিসে হামলা চালাবার চেষ্টা করে। এই দলটির কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিস্ফোরক, ডিনামাইট ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ২৬ জুলাই সোনামুড়া শহরের ওপর পাকিস্তানিদের গোলাবর্ষণে ২ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়। ১৭ জুলাই বেলা দুটো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাকিস্তানিরা ভারতীয় অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর গ্রামে গুলিবর্ষণ করে। এতে বেশকিছু শরণার্থী নিহত ও আহত হয়। একই দিন পাকিস্তানিদের অব্যাহত গোলাবর্ষণে ত্রিপুরার কলমচোরা এলাকায় শরণার্থীদের ৬ জন প্রাণ হারায়। ৩০ জুলাই 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর " গত ৬ দিনে খান সেনা ও তাদের তাঁবেদারেরা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েক দফা হামলা চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা ও ১৬ জনকে জখম করে। নিহতদের মধ্যে ২ জন এবং আহতদের মধ্যে ৬ জন ভারতীয় নাগরিক, বাকিরা শরণার্থী।"

ভারতের মাটিতে, বিশেষত ত্রিপুরা সীমান্তে যখন পাকিস্তানিদের অব্যাহত আক্রমণ চলছে, তখন ভারতীয় লোকসভায় ৩০ জুলাই ইন্দিরা সরকার প্রতিশ্রুতি দেন যে, "ভারত সীমান্তের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" লোকসভায় দেয়া হিসেব মতে, ২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানি গোলায় ৭৩ জন ভারতীয় নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই ত্রিপুরার ও বাংলাদেশের। সরকারি প্রতিনিধি কে.সি. পন্থ লোকসভায় এক বিতর্কে আরও বলেন, পাকিস্তান বাহিনী যদি কোনোভাবে সীমান্ত লংঘনের চেষ্টা করে, তা' হলে তার প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে নিরাপত্তা বাহিনীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই হুঁশিয়ারির পরেও বলতে গেলে প্রায় অব্যাহত গতিতেই পাকিস্তানি আক্রমণ চলতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত ভারতীয় নাগরিক ও সাধারণ শরণার্থীদের আত্মরক্ষার কৌশল জানিয়ে দেয় প্রশাসন। সেইসব কৌশলের ভেতরে ছিলো "১. কামান বা রাইফেল আক্রমণের কোনো সঙ্কেত পূর্বাহ্নে পাওয়া সম্ভব নয়। গোলাগুলির শব্দ শুনে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। সাধারণত কামানের গোলার দু' টি শব্দ হয়। একটি হয় কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে এবং অপর শব্দটি হয় গোলা লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়ে বিস্ফোরিত হবার সময়ে—দু' টি শব্দের ব্যবধান প্রায় অর্ধ মিনিট। প্রথম শব্দ না শুনলেও গোলা আসার শিস-শব্দ [Whistling Sound] শুনেও আত্মরক্ষা করতে পারেন। ২. আপনার বাড়ির কাছাকাছি যদি খোলা জায়গা থাকে তা' হলে ৮´ x ২´ ফুট এবং ৪´ ফুট গভীর পরিখা [Trench] কেটে রাখুন। এতে চারজন লোক আশ্রয় নিতে পারবেন। এই পরিখার আকার ইংরেজি z অক্ষরের মত হওয়া উচিত।"

মোটকথা, বাংলাদেশের এই যুদ্ধের দাহন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় প্রতিটি সীমান্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের মতোই অনুভূত হয়। যুদ্ধকালীন প্রতিটি প্রস্তুতি প্রায় প্রতিদিন

প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে লোকজনকে জানানো হয়, যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বিধান করা এবং আক্রমণ হলে উদ্ধার কাজ চালানো যায়।

৩০ জুলাই বিলোনিয়া মহকুমার সিদ্ধিনগর গ্রামে একটি পণ্যবাহী বেসরকারি ভারতীয় লরি অন্তর্ঘাতী চক্রের পোঁতা মাইনে বিধ্বস্ত হয়। আগস্ট মাসে আগরতলা শহরের একাংশে এবং সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ করা হয়, যাতে এইসব এলাকায় পাকিস্তানি চরেরা রাতের অন্ধকারে না ঢুকতে পারে। ৯ আগস্ট পাকিস্তানিরা সোনামুড়া শহর লক্ষ্য করে ১৪টি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। এতে একজন ভারতীয়সহ কয়েকজন শরণার্থী নিহত হয়। ১৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৪টায় পাকিস্তানি সৈন্যরা আগরতলা থেকে ৮ মাইল দূরে বামুটিয়ার জলিলপুর শরণার্থী শিবির ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রায় আধ মাইল ভেতর থেকে ১৩ জনকে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ধরে হানাদার সৈন্যরা বিনা বাধায় লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাবার পর ৪ জন তরুণীকে ধরে নিয়ে যায়। পরপর কয়েকদিন জলিলপুর এভাবে আক্রান্ত হবার পর রাজ্য সরকার ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেবার দাবি করেন। ১০ আগস্ট অরুন্ধতীনগর পুলিশ রিজার্ভ লাইনে দেয়া এক বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ বলেন, "পাক হানাদাররা আজ আপনাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আজ ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকে ক্যাম্পে রাখা, পরিচয়পত্র দেয়া ইত্যাদি কঠোর দায়িত্ব আপনাদের ওপর পড়েছে। সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক অন্তর্ঘাতকও এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তাদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করার দায়িত্ব আপনাদের। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের ভাইবোনেরা পাক হানাদারদের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন। এর উপযুক্ত জবাব তাদেরকে দিতে হবে।"

ত্রিপুরার ওপর পাকবাহিনী চাপ অব্যাহত রেখেছিলো কৌশলগত কারণেই। তারা ভালো করেই জানতো, আগরতলা বা ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চল থেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিফৌজেরা ঢাকা, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। বিশেষ করে আখাউড়ায় পাকিস্তানিরা সর্বোচ্চ রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ আখাউড়া রেল স্টেশনের মাত্র কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অসংখ্য শরণার্থী ও মুক্তিফৌজ ক্যাম্প অবস্থিত ছিলো। ১৪ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'সমাচার' পত্রিকা পুরো সীমান্ত অঞ্চলের সরেজমিন জরিপ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলো, তার কিয়দংশ ছিলো এ রকমের : "পাক ফৌজের আকস্মিক বুলেট ও গোলার আক্রমণ, পাক সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন এবং যুদ্ধের আশংকায় বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত চাষী–শ্রমিকের প্রায় ৪ হাজার পরিবারের আনুমানিক

২০ হাজার বাসিন্দা নিজেদের ঘরবাড়ি-আসবাব ফেলে পাক বুলেট ও গোলার আওতার বাইরে দূরবর্তী পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিলোনিয়ার সীমান্ত এলাকায় আমন ধান পাকতে শুরু করলেও গোলাবর্ষণের ভয়ে কৃষকগণ তা কাটতে না পারার ফলে এক ত্রাসজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিটি শস্য এলাকাতেই বিরাজ করছে।”

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর—এই তিনটি মাস বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা যেমনি বৃদ্ধি পায়, তেমনি ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানিদের অন্তর্ঘাতী তৎপরতাও জোরদার হয়। এমনিতে রাজ্যের আনাচ-কানাচ বাংলাদেশের শরণার্থীতে ঠাঁসা হয়ে যায়। তাদের আগমনের ঘটনা যেমন বোঝার' ওপর 'শাকের আঁটির মতো দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী করেছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘটিয়েছে চরম অবনতি, স্কুল-কলেজগুলো বন্ধ রাখতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি অব্যাহত পাকিস্তানি অন্তর্ঘাতী আক্রমণ ত্রিপুরাবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। অক্টোবরের এমনি এক সময়ে উপ-রাজ্যপাল বালেশ্বর প্রসাদ এক বেতার ভাষণে সীমান্ত পরিবেষ্টিত ত্রিপুরায় বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার মোকাবেলায় ভাবাবেগের প্রাধান্য না দিতে জনগণের কাছে আহ্বান জানান। তিনি সরকারি কর্মচারিদের সরকারি আচরণবিধি লঙ্ঘন না করারও আহ্বান জানান। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আগরতলা আসেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার, শরণার্থী ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, ত্রিপুরায় অক্টোবর মাসে রেজিষ্ট্রিকৃত বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা ছিলো ১২৪৭৩৩২ এবং রেজিষ্ট্রি বহির্ভূত সংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১১৯০০০ জন। এদের মধ্যে ৮৫২৫৯৬ জন বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল।

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যেদিন আগরতলা এলেন, অর্থাৎ ২০ অক্টোবর, সেদিন, সীমান্ত সংলগ্ন বিলোনিয়া শহর অব্যাহত পাকিস্তানি হামলার ফলে বিরান হয়ে গেছে। অফিস-আদালতে কর্মচারিদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। বিলোনিয়ায় ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তটি এমনভাবে জড়িত যে, এখানে বোঝাতে কষ্ট হয়, আসলে কোন্‌টা বাংলাদেশের আর কোন্‌টা ত্রিপুরার। অক্টোবর মাসে রাজধানী আগরতলার বুকে পাকিস্তানি অন্তর্ঘাত চক্রের নাশকতামূলক তৎপরতা, যেমন, মাইন ইত্যাদি স্থাপন অব্যাহত গতিতে চলে, অন্যদিকে ধর্মনগরের কেন্দ্রস্থলে কামানের গোলা নিক্ষেপ, সদর উত্তরাঞ্চলে সেতু ধ্বংস এবং বিমানবন্দর সংলগ্ন গ্রামগুলোতে গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। ২৭ অক্টোবর 'দৈনিক সংবাদ' এই মর্মে খবর ছাপে

“আজ সকালে রাজধানী আগরতলার মানুষ ঘুম জড়ানো চোখে প্রথম সংবাদ পেলো কোতোয়ালী থানা থেকে একশ' গজ দূরে কংগ্রেস ভবনের প্রবেশ মুখে পাক

অন্তর্ঘাত চক্রের পুঁতে রাখা একটি এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন দৃশ্যমান। নিরাপত্তা বাহিনী মাইনটি উদ্ধার করে। সৌভাগ্যবশত এটি বিস্ফোরণের আগেই দৃষ্টিগোচর হওয়ায় একটা বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি।" আক্টোবর মাসে একই দৈনিকে আরো একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়, যার শিরোনাম ছিলো "কামানের জবাব কামানেই হোক।" এবং এর ভাষ্যটি ছিলো এ রকমের ভারতীয় সীমান্তবর্তী গ্রাম আর শহরগুলোর ওপর পাক সেনাবাহিনী নির্বিচারে তাদের গোলান্দাজ মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন ওরা আমাদের সীমান্ত এলাকাকে তাদের নতুন গড়ে তোলা লড়াকু সেনাবাহিনীর চাঁদমারী করে ফেলেছে। পাকিস্তান সীমান্তের অদূরে বসে কামান দাগছে, আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। সুতরাং আমাদেরও অধিকার আছে তাদের কামনগুলোকে স্তব্ধ করে দেবার।" উল্লেখযোগ্য, ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা পৌনে আটটা নাগাদ পাকিস্তান বাহিনী আচমকা রাজধানী আগরতলার ওপর হালকা কামান থেকে পরপর ছ'টি গোলা নিক্ষেপ করে। ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত ও কুড়িজন আহত হন এবং বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। এই আকস্মিক আক্রমণে রাজধানীর জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। গোলা পড়ে বনমালিপুর, জেল রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তড়িৎমোহন দাসগুপ্তের বাসভবনের সামনে, মসজিদ রোড ইত্যাদি এলাকায়। সরকারি হিসেব মতে, এই সময়সীমা পর্যন্ত ১৫১ জন ভারতীয় নিহত হন। ২৫ অক্টোবর লোকসভায় এক বিবৃতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, পাকিস্তানকে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ভারতের নেই; কিন্তু আক্রান্ত হলে শত্রুর মাটিতে দাঁড়িয়েই আমরা লড়াই চালাতে সক্ষম। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারত ইতিমধ্যেই পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছিলো। পাকিস্তান তখন ব্যতিব্যস্ত পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে, তাই পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের ফলে পিণ্ডি পরিস্থিতির গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। এসময় পাকিস্তানের কিছু 'বন্ধুরাষ্ট্র' পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে ভারতকে চাপ দিতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছিলো সুস্পষ্ট, আগে ভারতে শরণার্থী আগমন বন্ধের ব্যবস্থা এবং আগত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হলেই তবে পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।"

১ নভেম্বর ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটগিরি এক ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের মন্ত্রিসভার বিলুপ্তি ঘটান এবং ত্রিপুরায় কেন্দ্রের শাসন কায়েম করেন। রাজ্য প্রশাসনের প্রতি কেন্দ্রের পরিবর্তিত মনোভাব, ক্রমাবনতিশীল সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে হঠাৎ করেই শ্রী সিংহ এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের বাংলাদেশ সংক্রান্ত কাজ-কর্মে আনুষ্ঠানিক

ইতি টানেন। ১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিন সপ্তাহব্যাপী তার সফল বিদেশ সফরশেষে নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের জানান, "বিনাযুদ্ধেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হতে পারে কি না সে বিষয়ে তিনি গভীর চিন্তা করছেন। তবে পরিণতি আদতেই কি দাঁড়াবে তা তিনি এক্ষুনি বলতে পারছেন না।" শ্রীমতী ইন্দিরার কথায় সেদিন গুরুতর পরিস্থিতির একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিলো।

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ তখন তুঙ্গে। কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটসহ প্রায় সব এলাকাতেই হাজার হাজার মুক্তিফৌজ দিনে-রাতে আক্রমণ করে চলেছে হানাদার বাহিনীকে। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দালাল বাহিনীর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সদস্যদের চোরাগোপ্তা হামলা ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। গেরিলাদের অব্যাহত আক্রমণে বিঘ্নিত হচ্ছে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ, পাকিস্তানিদের পক্ষে ট্রেন চলাচল করা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিপজ্জনক, রাতে ঘোরাঘুরি করা হানাদারদের জন্যে হারাম হয়ে গেছে প্রায়, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রগুলোতে বিস্ফোরক দিয়ে হানা হচ্ছে আঘাত। অন্যদিকে নভেম্বর পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানিরা মরণ কামড় দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। ওদের আক্রমণ এবং বিভিন্ন তৎপরতার ফলে, সরকারি হিসেবে, কমপক্ষে ১ লক্ষ লোক সাময়িকভাবে হয়েছিলো বাস্তুচ্যুত। ত্রিপুরার সীমান্ত সংলগ্ন প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কৃষিকাজ হয়েছিলো বস্তুতপক্ষে ব্যাহত এবং অন্তত তিনটি মহকুমা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য হয় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বিলোনিয়া, সোনামুড়া ও ফসলপুর শহর মূলত ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো নভেম্বরে।

১৬ ডিসেম্বর আখাউড়া থেকে গভীর রাতে রাজধানী আগরতলার ওপর ৭টি কামানের শেল এসে পড়ে। শেলগুলো পড়েছিলো বিদূরকর্তা চৌমুহনীর কাছে, শকুন্তলা রোডের ওপর এবং মধ্য পাড়ায়। এই হামলায় হতাহত হয়েছিলো অনেক মানুষ। ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের ২৫ জনের একটি দল আগরতলা বিমানবন্দর সংলগ্ন লঙ্কামুড়ার ওপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে হামলা চালায়। ভারতীয় বাহিনী সাথে সাথেই তার প্রত্যুত্তর দেয়। এই হামলায় ৩ জন ভারতীয় মারা যান। একই দিন লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের ১ম দিনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি এই পরিস্থিতির মোকাবেলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বিপদ আসন্ন নয়, বিপদ উপস্থিত।' প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, "পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের যে কোনো প্রচেষ্টা চূর্ণ করে দিতে আমরা বদ্ধ পরিকর।"

ত্রিপুরার সারা সীমান্ত এলাকায় তখন চলছে নিষ্প্রদীপ মহড়া। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিমান হামলা হতে পারে—এই রকম আশঙ্কায় থরোথরো। বেসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে জনসাধারণকে বিপদকালীন সময়ে জীবন বাঁচবার

পন্থা সম্পর্কে বলে দেয়া হচ্ছে। আগরতলা, বিলোনিয়া, সোনামুড়া, কৈলাসশহর ও ধর্মনগর ইত্যাদি শহরাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাঙ্কার খোঁড়া হয়েছে। অনেক পরিবার ঘরবাড়ি ফেলে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। সোজা কথায় ত্রিপুরার পুরো সীমান্ত অঞ্চলই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিলো। পাকিস্তানিদের যুদ্ধপ্রস্তুতি যতোই তীব্রতর হচ্ছিলো, সীমান্তের এই আক্রমণ ততোই বেড়ে চলেছিলো। বালুরঘাট, এফিমপুর, জলিলপুর, রামুটিয়া, রাখনা ও শর্মা প্রভৃতি এলাকার ওপর পাকিস্তানি হামলার প্রাবল্য তারই প্রমাণ।

পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে অব্যাহত পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত এবং বাংলাদেশ থেকে দখলদারী হানাদার সৈন্যদের বিতাড়নের জন্যে ৩ ডিসেম্বর সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং সেদিন থেকেই শুরু হয় যৌথ ভারত–বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযান। পাকিস্তানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভারত সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তখন থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামে ভারত। আর বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধকেই পাকিস্তান তখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রূপান্তরিত করে। পূর্বাঞ্চলের সাথে সাথে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বরেই আগরতলার ওপর তিনবার বিমান হামলা চালায় পাকবাহিনী। স্যাবর জেটগুলো আগরতলা বিমানবন্দর এলাকায় রকেট বোমা নিক্ষেপ করে। অন্যদিকে অমৃতসর, শ্রীনগর ও পাঠানকোট বিমানবন্দরের ওপরও পাকিস্তানি বিমান হামলা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু ভারত–বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে [লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং আরোরার নেতৃত্বে] পাকিস্তানি বাহিনী পূর্বাঞ্চলে যে আঘাতের সম্মুখীন হতে থাকে, সেটা সইবার সামর্থ্য তাদের ছিলো না। ৪ ডিসেম্বরেই আগরতলা সীমান্ত জোড়া হানাদার বাহিনীর শক্ত ঘাঁটিগুলো যৌথ বাহিনীর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে পাকিস্তানি স্থল বাহিনীর আক্রমণ থেকে আগরতলা বিপদমুক্ত হয়। অন্যদিকে একদিন পর পাকবাহিনীর একটি দুর্গের পতন ঘটিয়ে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলে গঙ্গাসাগর, আখাউড়া, উজানিসার, লাডুমুড়া, ফকিরামুড়া ও আজমগড় অভিমুখে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সত্তার প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানায়। লোকসভার স্বল্পকালীন এক অধিবেশনে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা মুহুর্মুহু করতালির ভেতরে ঘোষণা করেন আসমুদ্র ভারতের কোটি প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষিত বার্তা "বাংলাদেশ আজ এক স্বতন্ত্র নতুন রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি আজ এক নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক।" ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্র, বিশেষত কলকাতা ও আগরতলার, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই বলে লিখলো, "আসমুদ্র

ভারতের কোটি জনতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ভারতের শ্রেষ্ঠতম কর্মের নান্দী পাঠ করলেন।" অন্যদিকে চীন–যুক্তরাষ্ট্রের ভারত ও বাংলার মুক্তি সংগ্রাম-বিরোধী উদ্যোগের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৃতীয়বারের মতো 'ভেটো' দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলো। ওই সময় জাতিসংঘে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রী সমর সেন।

ভারতের স্বীকৃতি, জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ভেটো', অন্যদিকে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর অসাধারণ সাফল্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আনন্দের মহাবন্যা বইয়ে দিলো। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী বুঝতে পারে, দেশে ফেরার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত শেষ হযে আসছে বাস্তুহীন অনিশ্চিত জীবনের পালা। আনন্দে আত্মহারা ছাত্র, শ্রমিক, কর্মজীবী, রাজনীতিবিদ। মিষ্টি বিতরণের যেনো উৎসব শুরু হয়ে যায় ক্যাম্পগুলোতে। আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ'-এ এই সময় একটি বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ওই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো "বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংসদের পবিত্র চত্বর হতে স্বীকৃত হলো কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ইতিহাসের একটি পবিত্র লগ্নে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি জনতার প্রতিভূ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও হৃতসর্বস্ব সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পৌছে দিলেন মানব সভ্যতার বাঞ্ছিত লোকে।"

ষড়যন্ত্রের সমস্ত জাল ছিন্ন করে আর শত সহস্র সন্দেহের আবরণ ভেদ করে সবুজ ঘাসের দেশের লাল সূর্যের স্বীকৃতি ঘোষিত হলো রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের এক পূতপবিত্র লগ্নে। ৭ মার্চের বিকেলে রমনার বিশাল উদ্যানে লাখো জনতার উত্তাল তরঙ্গধ্বনি যে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলো, যে শপথ নিয়েছিলো বাঙালি জনতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে, তার পরিণতি আজ আট মাসের রক্তক্ষরা উষ্ণ অমসৃণ পথ বেয়ে পৌছুলো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

ডিসেম্বরের ১/২ তারিখ থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। আগরতলার ওপর পাকিস্তানি জঙ্গী বিমান বহর তখনো ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে। অন্যদিকে আখাউড়া রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয় হানাদার বাহিনী। হাসপাতালগুলোর মেঝে ভেসে যায় বিমান হামলায় হতাহতদের রক্তে। কিন্তু তাদের নাগরিক জীবন নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হলেও বিন্দুমাত্র মনোবল হারাননি আগরতলার মানুষ, তথা ত্রিপুরাবাসী।

১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ'র একটি বিবৃতি সারাদিন ধরে ভারতীয় বেতার থেকে প্রচারিত হতে থাকে। বিবৃতিটি ছিলো এ রকমের "১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনী যদি নিঃশর্তে নিকটস্থ ভারতীয় বাহিনী বা যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ অস্ত্র

সম্বরণ না করে তাহলে তাদের আর কোনো সময় দেয়া হবে না। যৌথ বাহিনী চারদিক থেকে পাকিস্তানিদের ঘিরে ফেলেছে।”

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং আজকের বাংলাদেশের প্রাক্তন গভর্নর কুখ্যাত মোনায়েম খান মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হবার পর ডঃ মালেককে গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন ইয়াহিয়া খান। কিন্তু বিপদ দেখে গভর্নর মালেক পদত্যাগ করে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের রেডক্রসের আশ্রয়ে চলে যান। ১৬ ডিসেম্বর দুপুর আড়াইটায় (ভারতীয় সময়) বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজী মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানালে জেনারেল মানেকশ ঢাকার ওপর ভারতীয় বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দেন। পাকবাহিনী বুঝতে পারে তাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া পথ নেই। যদিও সর্বাধুনিক আণবিক অস্ত্র নিয়ে মার্কিন ৭ম নৌবহর তখন বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেছে প্রায় মৃত পাকবাহিনীকে সহায়তা করতে; কিন্তু ভারত মহাসাগরের দিকে দ্রুত ধাবমান হয় তখন রুশ ‘বাল্টিক’ নৌ-বহরের দু’টি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌবহরের আগমনের সংবাদে শিবিরে শিবিরে লক্ষ শরণার্থী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ‘আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে’ তারা অভিসম্পাত দিতে শুরু করে দেয়। ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. এল. ঝা এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই মুহূর্তে মন্তব্য করেন, “বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত আমেরিকান ও বিদেশী নাগরিকদের উদ্ধারের নামে যে কোনো বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারত অমিত্রসুলভ আচরণ বলে বিবেচনা করবে এবং এই বদ মতলব বরদাশ্‌ত করা হবে না।”

পাকিস্তানি সেনাপতি লেঃ জেঃ নিয়াজীকে বলা হয়েছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে। তার কাছে খবর পৌছানোর জন্যে বিশেষ বেতার কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং দেয়া হয়েছে কোড নম্বরও। সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোতে তখন সকলের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। আর এদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা যেভাবে পারছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জীবন বাঁচিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে আসছে।

অবশেষে মুক্ত হলো রাজধানী ঢাকা। বাঙালির আজন্ম লালিত স্বাধীনতার পবিত্র মুখ হলো উদ্ভাসিত। বর্বর হানাদার বাহিনী হলো নতজানু। বাংলার শ্যামল প্রান্তর জুড়ে উড়তে থাকে বিজয় পতাকা।

আবার সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। ৭ মার্চ যে ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় দীর্ঘ ২৮২টি কালো রাতের অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ জগজিৎ সিংহ্ অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন পরাজিত বাহিনীর সেনাপতি লেঃ জেঃ নিয়াজী। ফৌজি রীতি অনুযায়ী বিজয়ী সেনাপতি বন্দী সেনানায়ক নিয়াজীর সামরিক পোশাক থেকে খুলে নেন জেনারেলের ব্যাজ। সেই সাথে যুদ্ধবন্দী হয় ৯২ হাজার হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য।

কিছু মুখ, কিছু স্মৃতি

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরকারই শুধু আমাদের বন্ধু ছিলো না, ছিলেন ভারতবাসীও। পৃথিবীতে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের জন্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল ঘটনা, অথচ সেদিনকার পূর্ব বাংলাবাসী তা-ই পেয়েছিলেন ভারতের জনগণের কাছ থেকে। রাষ্ট্রীয় নীতি বা কূটনীতি পড়োশী এই দেশ দু'টিকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে, আমি জানিনে, তবে ১৯৭১ সালে ভারতের জনগণ এবং সরকারের মধ্যকার সাহায্য-সহযোগিতা পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের এক প্রধান ও অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়।

এই ঐতিহাসিক সঙ্কট-সীমায় আগরতলা তথা সমগ্র ত্রিপুরার কিছু অজানা মুখ চিরচেনা হয়ে গিয়েছিলো আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। এই মুখগুলো এতোই বেশি আপন হয়ে গিয়েছিলো যে, সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা যতোদিন বেঁচে থাকবেন, হয়তো কখনোই বিস্মৃত হবেন না, ভুলতে পারবেন না তাঁদের কথা। তাঁরা ত্রিপুরা অথবা আগরতলার স্মৃতি। এই মুখগুলোর একটি অনিল ভট্টাচার্য্য। 'যুগান্তর' পত্রিকার আগরতলার সংবাদদাতা। অনিল বাবুকে আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের বিশ বছর পর। কিন্তু এর আগে বহুবার প্রয়াত নেতা আব্দুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রয়াত জহুর আহমদ চৌধুরী, এম. আর. সিদ্দিকী, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মেজর রফিকুল ইসলামসহ অসংখ্য অগণিত লোকের মুখে শুনে এসেছি মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু এই সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য্যের নাম।

অনিল বাবুর বয়েস এখন প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই। মেলার মাঠে সরকারি চাকুরে স্ত্রী সুনন্দা ভট্টাচার্যির নামে বরাদ্দকৃত বাড়িটাতেই তিনি থাকেন এখনো। এই বাড়িটিই ছিলো ১৯৭১-এ ত্রিপুরাকেন্দ্রিক বাংলাদেশের রাজনীতিক, ছাত্রনেতা এবং বাঙালি সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রধানতম ঘাঁটি। আধাপাকা বাড়িটাতে নিত্যদিন চা হয়েছে শত শত কাপ। খালি ফ্লোরে বসে সলাপরামর্শ করেছেন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আ.স.ম. আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ, স্বপন চৌধুরী ও নূরে আলম সিদ্দিকী। এই বাড়িটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম নেতা মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর ভুঁইয়া, মেজর রফিকুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ থেকে শুরু করে অধিকাংশ এম.এন.এ/এম.পি.এ এখানে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় তখন ছাপাখানা বড় বেশি ছিলো না। অনিল ভট্টাচার্য্য 'সাপ্তাহিক সমাচার' নামে স্থানীয় একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর মালিকানায় একটি

প্রেসও ছিলো। নাম 'ইমপ্রেস'। বলতে গেলে এই ছাপাখানাটিকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডে। অনিল ভট্টাচার্য্যের খেলার মাঠের বাড়িটাতে বসেই প্রথম যৌথ আন্তর্জাতিক বিবৃতিতে সই করেছিলেন বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা, সে কথা আগেই বলেছি।

একবার জীবন বাঁচাতে গিয়ে উঠেছিলেন সে বাড়িতে চিত্রনায়িকা কবরী। 'সাপ্তাহিক সমাচার'-এর প্রথম পাতায় রিপোর্ট বেরিয়েছিলো এ ব্যাপারে ১৮ এপ্রিল তারিখে। "এক ক্রন্দসী নায়িকার মর্মস্পর্শী আত্মকথা"—এই ছিলো তার শিরোনাম। রিপোর্টটি ছিলো এ রকমের "পূর্ব বাংলার গঠনশীল চলচ্চিত্রের স্বনামধন্যা ও জননন্দিতা শিল্পী কবরী চৌধুরী ছিন্নমূল হয়ে স্বামী-সন্ততির হাত ধরে এই সীমান্ত শহরে আশ্রয় প্রার্থী হয়েছেন। পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র তাঁর অভিনয়ের দীর্ঘ এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্য । বহু সম্মান ও করতালিও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিলো। কিন্তু যে হানাদারেরা সোনার বাংলাদেশকে শ্মশানের পৈশাচিক ক্ষমতায় টেনে নিয়েছে– তাদের বোমার আগুনে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ভাগ্যই জ্বলছে। একজন শিল্পী তার থেকে বাদ পড়বেন কেন। শ্রীমতী কবরী ঢাকা নগরীর দুঃসহ অত্যাচারের ভয়াবহ বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।"

অনিল ভট্টচার্য্যের ছোট্ট দু'টি মেয়ে তখন। ওদেরকে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন স্ত্রী সুনন্দা। ঘর থেকে খাট খুলে খেলা হলো। বিস্তর জায়গা দরকার, তাই। কে কখন আসবে—কখন শোবে—সলাপরামর্শ করবে—তারতো ঠিক নেই। অনিল বাবুর সাংবাদিকতা 'যুগান্তর'কে যেমনি একদিকে কলকাতাকেন্দ্রিক কাগজগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারযন্ত্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলো, তেমনি ব্যক্তি অনিল ভট্টাচার্য্যকেও করেছিলো শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অতি কাছের মানুষ। অনিল বাবুর মনের ভাণ্ডারে এতো স্মৃতি সঞ্চিত যে, তিনি বারবার জিগ্যেস করা সত্ত্বেও, গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না কিছু। একজন থেকে আরেকজন, এক নাম থেকে আরেক নাম।

শ্রীমতী সুনন্দা ভট্টাচার্যি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা। তৎকালীন আওয়ামী লীগ এম.পি.এ মমতাজ বেগমকে নিয়ে শরণার্থীদের মধ্য থেকে বেছে বেছে পাকিস্তানিদের হাতে নির্যাতিতা মা-মেয়েদের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করতেন তিনি। নির্যাতিতা শরণার্থীরা বিপদমুক্ত হয়েছেন। এ না হলে বর্বর পাকিস্তানিদের ক্ষতচিহ্ন বহন করে বেড়াতে হতো তাদের সারাটা জীবন। যেমনটা হয়েছিলো মার্কিন দখলদার সৈন্যদের উপস্থিতিতে ভিয়েতনামে।

তৎকালীন ক্যাপ্টেন ও পরে ব্রিগেডিয়ার ভূঁইয়া তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন "...আমি ১৪ এপ্রিল তারিখে স্ত্রীকে নিয়ে আগরতলা রওনা হই। উদ্দেশ্য ছিলো তাকে বাড়িতে রেখে আসা। আগরতলা যাবার পর সেখানে 'যুগান্তর' পত্রিকার

সংবাদদাতা অনিল বাবুর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। ভদ্রলোক বলতে গেলে সোনার মানুষ। ব্যবহারে অমায়িক, কথাবার্তায় খুবই মার্জিত। সহজ–সরল এই মানুষটি অত্যন্ত উপকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য।"

ডাঃ মুজিত দে এমনি আরেকজন মানুষ, যার রবীন্দ্র পল্লীর সরকারি বাসভবনটি হয়ে উঠেছিলো খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান ও নুরুল ইসলাম শিশুসহ অসংখ্য মুক্তিসেনানীর প্রায় সার্বক্ষণিক ঘাঁটি। চিরকুমার ডাঃ দে আজ ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু–রোগ বিশেষজ্ঞ। এখনো স্মৃতিতে আনতে ভালোবাসেন তিনি তাঁর বন্ধুদের—যাঁদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভাগ্যজনক রক্তপাতে হারিয়ে গেছেন পৃথিবী থেকে। সুজিত দে'কে এই বলে অনুরোধ করেছিলাম, কিছু বলুন সেই পুরনো দিনের কথা ? বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ডাঃ দে বললেন, "কি আর বলবো ! খালেদও নেই, জিয়াও নেই। মুক্তিযুদ্ধের ওঁরা একে একে সবাইতো গেলো। বলার আর কি আছে ! ওদের সাথে আর তো দেখাই হলো না। জিয়া অবশ্য চিঠি দিয়েছিলো। যেতে। যাওয়া হয়নি।"

শুধু পত্রিকার মালিক হিসেবে নয়, 'দৈনিক সংবাদ' সম্পাদক হিসেবেও ভূপেন দত্ত ভৌমিকের ভূমিকা ছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর পত্রিকার দফতর ছিলো মুক্তিযুদ্ধকালীন আগরতলার আরেক ঘাঁটি। বুদ্ধিজীবী, ছাত্রনেতা ও শরণার্থী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ সেদিনকার জগন্নাট বাড়ি রোডের অফিসে যাতায়াত করতেন। ওঁদের অনেকেই এখনো জানতে চান, কেমন আছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এম.পি.এ লুৎফুল্লাহ হাই সাচ্চু, মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম, আ.স.ম. রব ও শাহজাহান সিরাজ। সব খবর আমার নিজেরই জানা নেই পুরোপুরি।

ত্রিপুরার সে সময়কার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের অধিকাংশ আজ সেখানে নেই। কেউ অবসর নিয়েছেন, কেউ চলে গেছেন অন্যত্র। কেউবা দেহত্যাগ করেছেন। তবে চিফ সেক্রেটারি আই. পি. গুপ্ত, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওমেস সায়গল, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পি.এন. ব্যানার্জি, পাবলিসিটি বিভাগের গুরুপদ সাঁও, সরকারি কর্মকর্তা কে. সি. সিনহা, খোয়াইয়ের ও.সি. মণি সেন, ডেপুটি সেক্রেটারি জীতেন্দ্র সেন, ব্যবসায়ী অমর ঘোষ, জেলা জজ সুবোধ বাবু, প্রমোদ আচার্যি, এস.এম. আলী—ত্রিপুরা রাজ্যের এমন অসংখ্য নাম জড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে। সে সময়কার চিফ কনজারভেটর-অব-ফরেস্ট নীরেন ভট্টচার্যি, সাব্রুমের পুলিশ অফিসার বীরেন মুখার্জী, সর্বোপরি ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং, 'ক্যাপ্টেন আলী' ছদ্মনামের ভারতীয় ক্যাপ্টন পি. কে. ঘোষ ও ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্তের নাম ভুলে গেছেন এমন মুক্তিযোদ্ধা খুব কমই

আছেন যাঁরা অন্তত ত্রিপুরা তথা আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বাবা অমরেন্দ্র ভৌমিক ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা। দেশ বিভাগের অনেক আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি এই বাহিনীতে। ওঁর মা বরিশালের এক বিপ্লবী পরিবারের মেয়ে। মুক্তিযুদ্ধের কুড়ি বছর পর তাঁদের স্মৃতির কথা জানতে চাইলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ওঁরা। প্রায় সত্তর বছর বয়সী অমরেন্দ্র বাবু তাঁর সেদিকার সেই অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, সেটা ছিলো হারানো ভাই ফিরে পাবার মতো একটা অনুভূতি। আমরা সবাই যেনো মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। কে হিন্দু, কে মুসলমান— একবারও কেউ জানতে চাইনি।

রবি সেন, চিত্ত সেন এবং দীলিপ দেবরায়। তিন ফটোগ্রাফার। অগণিত ছবি তুলেছেন এঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময়। ওঁদের সেই ছবিগুলো অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে নেগেটিভ। "আগে যদি জানতাম মুক্তিযুদ্ধের বিশ বছর পর আপনার মতো কেউ এসে ছবিগুলো আবার চাইবেন, তা' হলে হয়তো সত্যিই ঠিকঠাক করে রাখতাম নেগেটিভগুলো—" বিশ বছর পর স্মৃতির জাবর কাটাতে কাটাতে বললেন চিত্ত সেন। রমাপ্রসাদ দত্তের নিজস্ব লাইব্রেরি পুরনো গ্রন্থাদির এক চমৎকার ভাণ্ডার। হাজারো বই। ছোট্ট একটা কামরায় চিরকুমার রমাপ্রসাদ অর্থাৎ পন্টুদা গুছিয়ে রেখেছেন সেইসব বই, ম্যাগাজিন আর পত্র-পত্রিকা। এসবের অধিকাংশই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত। এই শৌখিন সংগ্রহকারীর সঞ্চয় দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি।

সরোজচন্দ বাবু গুছিয়ে ধীরেসুস্থে কথা বলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। আজও আছেন। তিনি তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে জানালেন, "না, আমার আর সাধ্যই-বা কি ছিলো ! যদ্দুর পেরেছি করেছি। এমন বেশি কিছু করিনি যে লিখতে হবে।" সরোজ বাবুর কণ্ঠ থেকে একরাশ বিনয় ঝরে পড়ে। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সাথে সিপিআই থেকে আরও জড়িত ছিলেন ঝনু দাস ও অঘোর দেব বর্মন। সিপিআই (এম.এল) নেতা এবং "ডেইলি দেশের কথা'-র সম্পাদক গৌতম দাস দলের পক্ষ থেকে জড়িয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কাজকর্মে। গৌতম বাবু পার্টি থেকে সংযোগ রক্ষা করতেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা বামপন্থী দলের নেতা-কর্মীদের সাথে। মণি সিংহ, অনিমা সিংহসহ বাম নেতাদের অনেককে প্রথমে জায়গা করে দেয়া হয়েছিলো ক্র্যাফট্‌স্ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হোস্টেলে। পরে অন্যত্র।

ব্যক্তির পাশাপাশি আগরতলার কিছু ঘরবাড়িও সাক্ষী হয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জ্বলজ্বলে ঘটনার সঙ্গে। মেলার মাঠের এম.এ.এস হোস্টেলটি ছিলো দেশত্যাগী রাজনৈতিক নেতা ও তাঁদের কাজকর্মের প্রধান ঘাঁটি। একাত্তর

পরবর্তীকালে বাড়িটির চেহারা বদলে গেছে এবং নতুন পরিচয় হয়েছে তার 'নজরুল ছাত্রাবাস'। কর্নেল চৌমুহনীতে আজকে যে ঘরটার নাম 'কেয়ার এণ্ড কিওর' নার্সিং হোম, ১৯৭১ সালে নীরেন ভট্টাচার্যির এই ঘরটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুখ্য রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়স্থল। এই বাড়িতে বসেই গোপন সলাপরামর্শ হয়েছে নেতাদের। এখানেই গৃহীত হয়েছে মুক্তিসংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা।

মুক্তিযুদ্ধে বিপ্লবী সরকারের ক্ষুদ্রাকারের একটি বিমান বাহিনী ছিলো, যার অধিনায়ক ছিলেন এ. কে. খন্দকার। তাঁর সাথে ছিলেন বীরযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ। তৎকালীন পিআইএ-র বেশকিছু বাঙালি পাইলট বিদ্রোহ করে যোগদান করেছিলেন মুক্তি সংগ্রামে। এঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন আকরাম, ক্যাপ্টেন সাত্তার এবং ক্যাপ্টেন সাহাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের ঘাঁটি ছিলো আগরতলা।

মুক্তিযুদ্ধের কুড়ি বছর পরও অনলবর্ষী বেগম মতিয়া চৌধুরীর জ্বালাময়ী ভাষণের কথা এখনো অনেক আগরতলাবাসীর স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে। এককালের তুখোড় ছাত্রনেত্রী মতিয়া চৌধুরী আগরতলার মোড়ে মোড়ে ভাষণ দিয়ে শরণার্থী ও ভারতীয় জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করেছিলেন। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত আগরতলায় ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের ভেতরে সিকান্দার আবু জাফর, ডঃ এ. আর. মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ কামাল হোসেন, ফয়েজ আহমদ ও মমতাজ উদ্দিন আহমদ। এঁদের অধিকাংশই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্যে কথিকা লিখতেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আগরতলায় গঠিত হয়েছিলো 'বাংলাদেশের স্বপক্ষে' নামে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন। আগরতলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন বিমল চৌধুরী, সহ-সভাপতি নিধু হাজরা, সাধারণ সম্পাদক শান্তি হালদার, যুগ্ম সম্পাদক অজিত ভৌমিক ও বিশ্ব সেন এবং কোষাধ্যক্ষ চিরব্রত রায় বর্মন। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় সারা আগরতলায় অনুষ্ঠান করে গেছে।

কলেজ টিলার ছাত্রাবাসটি ছিলো বাংলাদেশের মুখ্য ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের মূল ঘাঁটি। ছাত্রলীগের প্রায় প্রতিটি নেতা ও কর্মী প্রথমে এখানে এসে উঠতেন এবং পরবর্তীকালে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে যেতেন। এ ছাড়াও প্যালেস কমপাউণ্ডের বাড়ি, শ্রীধর ভিলা, এম.বি.বি. কলেজ হোস্টেল ইত্যাদি নামগুলো আগরতলাকেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডে চিরস্থায়ী নাম হয়ে আছে। বিভিন্ন ক্যাম্প পরিচালনা এবং শিবির তত্ত্বাবধানে এ সময় জড়িত ছিলেন গণপ্রতিনিধি মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক পুলিন দে, আবদুল্লাহ-আল-হারুন, মীর্জা আবু মনসুর, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, খাজা আহমদ, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর,

সামসুজ্জোহা এবং ছাত্রনেতাদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণি, আ.স.ম. আবদুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ, স্বপন চৌধুরী, আবুল বাশার মৃধা, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও অন্যান্য।

ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারিদের ভেতরে তৌফিক এলাহীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙালি বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে রামগড় হয়ে আগরতলা চলে আসেন এবং পরবর্তীকালে বিপ্লবী সরকারের কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদান রাখেন। মাহবুবুল আলম চাষী কিছুদিনের জন্যে আগরতলায় ছিলেন। সে সময়ে চাষী সাহেব, খন্দকার সুলতান আহমদ এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে প্রায়শই একযোগে বৈঠক ও সময় কাটাতে দেখা গেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মুক্তিযুদ্ধের একেবারে গোড়া থেকেই স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ছিলো সক্রিয়।

সাউথ রোড অথবা দক্ষিণ ত্রিপুরা মহাসড়ক ছিলো ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যোগাযোগের প্রধান রাস্তা। চারদিকে প্রচুর শালবন। আগরতলা থেকে উদয়পুর হয়ে বিলোনিয়া পর্যন্ত পৌছুতে হলে ঘন–গভীর শালবনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়ক পেরোতে হয়। এই সড়কের দু'পাশ বরাবরই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো গড়ে উঠেছিলো। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সাত-আট মাসের অস্থায়ী নিবাস গড়ে তোলা হয়েছিলো এখানে। কিন্তু এখন তেমন জনমানুষের বসতি নেই ওখানে। ঝোপজঙ্গল আর কীটপতঙ্গের অবাধ ক্ষেত্র এখন সেকের কোট, বিশাল গড়, বীরবন্ধু নগর, কমলামনির, নরসিঙ্গড়, বক্সনগর, বিলোনিয়া। এইসব জায়গাতেই ছিলো শিবির। আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই।

আগরতলা বা ত্রিপুরার মাটি থেকে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন এখন সত্যিই মুছে গেছে। যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশের মনের দাগ আজো বোধ করি মোছেনি। অরুণদ্যুতি নগরের বেলতলা গ্রামের মাণিক হালদার তাঁর স্ত্রী এবং তাদের মেয়ে টিঙ্কু আর পাপড়ি এখনো মুন্সীগঞ্জের হারুন-আর-রশিদের কথা মনে করেন। হারুন-আর-রশিদ ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। মাণিক বাবুর বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি যুদ্ধের ক'টি মাস। শত্রুমুক্ত দেশে ফিরে চিঠি দিয়েছিলেন রশিদ সাহেব। তার জবাবও দিয়েছিলেন এই পরিবারের সদস্যরা। সেই চিঠিগুলোকে যেমনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন রশিদ সাহেব, তেমনি হৃদয়ের ফিতেয় সেগুলোকে আজও বেঁধে রেখেছেন শিল্পী হালদার পরিবারের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা। ক্রান্তিকালের সেই বন্ধন যে কতো গভীর, আগরতলায় না গেলে কখনোই তা জানা হতো না আমার।

এম. এল.এস হোস্টেলটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মুসলিম ছাত্রাবাসে পরিণত হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছেলে থাকে এখন সেখানে। সময়ের ব্যবহারে বাড়িটির আদর্শ বদলেছে অনেকটা। কিন্তু স্বাধীনতার কুড়ি বছর

পর সেই বাড়িটিতে প্রবেশ করে আমি অনুভব করেছি একাত্তরের সেই দিনগুলোর উত্তাপকে। প্রতিটি কামরায় ঠাঁসাঠাঁসি করে শোওয়া-বসা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের লড়াকু মানুষ। নববধূ নিয়ে উঠেছেন সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন। নির্বাচিত গণ–প্রতিনিধিরা এক একটা রুমে গাদাগাদি করে আশ্রিত। এরই ভেতরে চলছে কলকাতা-আগরতলার মধ্যে নিত্যদিনের যোগাযোগ। পাশাপাশি সীমান্তের ওপার থেকে প্রতিদিন আসছে হাজার হাজার দেশত্যাগী মানুষ নির্যাতনের কাহিনী বহন করে। পাকবাহিনী কারও বাড়িতে আগুন দিয়েছে, কারও স্ত্রী বা মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, কারও-বা খোঁজ নেই পরিবার-পরিজনের, কিংবা কেউ এসেছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে। দুঃখ আর আহাজারির ভেতরেই গর্জে উঠেছে প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের বাণী। গম গম করে উঠেছে তাতেই এম.এল.এস হোস্টেলের একেকটা কামরা।

শাশ্বতী ভট্টাচার্যির ডাকনাম বাবুল। একাত্তরে ওঁর বয়েস ছিলো পাঁচ অথবা ছয়। কুড়ি বছর পরে এখন তার বয়স প্রায় পঁচিশ। শৈশবের সেই ধোঁয়াটে স্মৃতি এখন আর তেমন স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। তবু একাত্তরের আগরতলার বাড়িটাকে আজো তাঁর বাংলাদেশেরই কোনো একটা বাড়ি বলেই মনে হয়। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে বাবা অনিল ভট্টাচার্য্যের সাথে বাংলাদেশ ঘুরে গেছে বাবুল। ১৯৮১-এর ২৩ জানুয়ারি জিয়া সাহেব বঙ্গভবনে দেখা করেন তাঁদের সাথে। আগরতলার পুরনো স্মৃতি যাঁরাই রোমন্থন করেন বাবুলের কাছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের কেউ, তারাই হয়ে যায় তার একান্ত আপন মানুষ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বাংলাদেশে এনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি আগরতলার এই মাননীয় নেতাকে। সেই সাথে এসেছিলেন অনেক সাংবাদিক, এসেছিলেন বিকচ চৌধুরী, যিনি ছিলেন ১৬ ডিসেম্বরের মহালগ্নে রাজধানী ঢাকায়। ১৬ ডিসেম্বরের ঢাকার অনেক কিছুরই সাক্ষী আগরতলার বিকচ চৌধুরী। ১৮ ডিসেম্বর বেগম মুজিবকে তাঁর পরিবার-পরিজনসহ বন্দী দশা থেকে উদ্ধার করা হলে সেদিন তাঁর ছবি তুলেছিলেন অনেক ভারতীয় আলোকচিত্রীর সাথে আগরতলার রবি সেন।

সুবীর ভৌমিক নতুন প্রজন্মের আগরতলাবাসী। একাত্তরে তাঁর বয়স ছিলো সবে চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরো। পৈত্রিক ভিটে তার বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই ওঁর, যদ্দুর আছে সেটা তার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত ধাবমান মুক্তিফৌজ আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ধুলোমাখা ট্রাক, আগরতলার অলিতেগলিতে গিজ গিজ করা মানুষ আর সে সময় পরিপূর্ণ যুবক না হতে পারার আক্ষেপ। ওঁর স্ত্রী শর্বরীরও স্মৃতি অনেকটা ধোঁয়াটে। কতোই-বা তার বয়স তখন, হৃদয়ের গভীরে তবু কী যেনো একটা টান — !

জগদীশ চন্দ্র আচার্য একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরের এই সক্রিয় বীর যোদ্ধা আজ ত্রিপুরার মানুষ। কবি আচার্য এখনো ভোলেননি তাঁর জন্মস্থান নরসিংদী, তাঁর প্রিয় জন্মভূমির কথা। কবি সত্যব্রত চক্রবর্তীর বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। একাত্তরে কলকাতার দৈনিক 'স্টেটসম্যান'-এর আগরতলাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন সত্য সাহা। এখনো আছেন। একাধিককার ঢুকেছেন তিনি বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধের খবর নিতে। যতোবার ঢুকেছেন ততোবার তাঁর বাবার কথা মনে পড়েছে, মা'র কথা মনে পড়েছে। মনে পড়েছে কুমিল্লায় তাঁর শৈশবের স্মৃতি। দেশ-বিভাগ হৃদয়টাকে ভাগ করতে না পারলেও দেহটাকে তো ভাগ করেছে। বাঙালি আজ বিভক্ত, কিন্তু বিভক্ত হয়নি বাঙালিত্ব। ভাগ হয়নি হৃদয়। কোনোদিন হবার নয়।

স্মৃতিপত্র

শচীন্দ্রলাল সিংহ, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা রাজ্য

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং সেই বিজয়ের ঘটনায় ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্র ভীত হয়ে শুরু করে ষড়যন্ত্রের ঘোট পাকাতে। তারা মরিয়া হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিজয়ী আওয়ামী লীগ যাতে কোনোভাবেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেই চেষ্টা চালায়। আর সেই ষড়যন্ত্রের পরিণতিতেই ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্রের নির্দেশে পাকবাহিনী আকস্মিকভাবে '৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখ থেকে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় একযোগে শুরু করে বাঙালি গণ-নিধনযজ্ঞ।

গ্রেফতার হলেন বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিব। প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা থেকে তাঁকে সোজা ইসলামাবাদের কারাগারে। চলতে লাগলো ধরপাকড়, হত্যা, গুম, খুন, ধর্ষণ, অগ্ন্যুৎসব আর ধ্বংসের তাণ্ডব। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ তাই ২৭ মার্চ থেকেই প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে আসতে থাকেন সীমান্তের বেড়াজাল উপেক্ষা করে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। ওই একই তারিখে আগরতলায় ঢুকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন কর্নেল ওসমানী। তার সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিত দিল্লিতে নিযুক্ত ফিন্যান্স এডভাইজার। তিনি ছিলেন ঢাকার নবাববাড়ির ছেলে। এখন আর তার নাম মনে পড়ে না। এর পরপরই আগুপিছু করে এখানে এলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, কুমিল্লার মিজানুর রহমান চৌধুরী আর একজন উকিল, তারও নাম এখন আর মনে পড়ে না। চট্টগ্রাম থেকে এলেন নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম. আর. সিদ্দিকী, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন

আহমদ, কামারুজ্জামানসহ সর্বসমেত ৭৫জন সংসদ সদস্য। এলেন ক্যাপ্টেন দত্ত, বাঘা সিদ্দিকী, মেজর ডালিম, মীর শওকত, মেজর হুদা, মেজর রশিদ, মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন রব। আর ছাত্রনেতাদের মধ্যে এলেন রব, মাখন, মহম্মদ খসরু। তারা সঙ্গে নিয়ে এলেন বেতার কেন্দ্র। আগরতলা থেকে সেই বেতারযোগে একদিন ঘোষণা দেয়া হলো স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকারের। তবে তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবের গ্রেফতারির বিষয়টি গোপন রাখা হলো।

এর পরপরই সেই তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কর্নেল, মেজর আর ক্যাপ্টেনদের নিয়ে শুরু হলো গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার কাজ। ত্রিপুরার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গড়ে উঠতে থাকা সেইসব গেরিলা গ্রুপের নাম রাখা হলো দুই বাংলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদীগুলোর নামানুসারে। যেমন গোমতী, তিতাস, পদ্মা মেঘনা ইত্যাদি। ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ ও যুবকের দল নাম লেখাতে লাগলো এইসব গেরিলা বাহিনীতে। তাদের পোশাক ছিলো খাকি রঙের। খাকি প্যান্ট, খাকি শার্ট, কেডের জুতো, এনামেলের তৈরি ফ্লাক্স্। এইসব কাজের নেপথ্যে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন ভারতের দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ। যেমন: বোম্বের শ্রী ভিমানী, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ত্রিগুণা, প্রাক্তন এমপি শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, এমপি রাজ নারায়ণ শ্রীরাজ বাহাদুর, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী অম্পুরী ঠাকুর, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল, এমপি গুলজারীলাল নন্দ, শশাঙ্ক আচার্য্য এবং ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্যের ছেলে।

ত্রিপুরার সমস্ত হাসপাতাল, ডিসপেনসারি ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র তখন উন্মুক্ত করা হয়েছিলো আগরতলায় আগত বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য। শরণার্থীরা নিজেদের উদ্যোগেই বাঁশ, খুঁটি, চাটাই, শন ইত্যাদি যোগাড় করে রাতারাতি তুলে ফেললেন কোনোমতে বসবাসযোগ্য চিলতে ঘর। তারই ভেতরে তাদের গাদাগাদি করে বসবাস। অবশ্য এইসব ঠাঁই গড়ে তুলবার ব্যাপারে আগরতলা বা ত্রিপুরাবাসীরও সক্রিয় সহায়তা কম ছিলো না।

আগত শরণার্থীদের ভেতরে যারা পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হামলার শিকার হয়ে আহত হয়েছিলেন, শারীরিকভাবে কোনো–না-কোনোভাবে বরণ করেছিলেন পঙ্গুত্ব, তাদেরকে কোনো রকম বিলম্ব না করে পাঠানো হয়েছিলো আগরতলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিসপেনসারিগুলোতে। এ জাতীয় রুগী বা আহতদের চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত ছিলেন অসংখ্য মানবদরদী চিকিৎসকের ভেতরে প্রখ্যাত কয়েকজন চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞও। যেমন ডাঃ মেজর দত্ত, ডাঃ খগেশ নন্দী, ডাঃ দ্বিগেন ব্যানার্জি। সেইসাথে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বেশকিছু চিকিৎসকের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের নিয়েই আহত বা অসুস্থ শরণার্থীদের

চিকিৎসা-সেবার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিলো চিকিৎসকমণ্ডলী। এবং পাশাপাশি 'সার্জিক্যাল অপারেশন' অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ থেকে আগত 'সার্জিক্যাল' ডাক্তারদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিলো একটি 'সার্জিক্যাল বোর্ড'। এই বোর্ডে ছিলেন বাংলাদেশের বেশ ক'জন খ্যাত-অখ্যাত অথচ দেশ ও মানবদরদী চিকিৎসকসহ আগরতলার ডাঃ রথীনদত্ত, ডাঃ রায় চৌধুরী ও ডাঃ কর প্রমুখের মতো চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। এই সার্জিক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এম. আর. সি. এস. ডাঃ রথীন দত্ত। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই হাজার হাজার শরণার্থী মানুষ আর বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর আহত সদস্যের জীবন রক্ষা পেয়েছিলো। জীবন রক্ষা পেয়েছিলো নানাভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া লাখ লাখ পূর্ববাংলাবাসীর। রক্ষা পেয়েছিলো আসন্ন প্রসবা মা-জননীদের জীবন।

ত্রিপুরায় সেইসময় লোকসংখ্যা ছিলো ১৬ লাখ। ৪১১৬ বর্গমাইল এলাকার ভেতরে ওই পরিমাণ জনসংখ্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের বাড়তি ১৫ লাখ শরণার্থী মানুষ। শুধু তাই নয়, তার তিনভাগ এলাকাই পরিণত হয়েছিলো রণক্ষেত্রে। এই রকম এক অসহনীয় আর অসুস্থ-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও কোনো রকম মহামারী হয়নি, কোনো মানুষ মহামারীতে মারা যায়নি। কিংবা না খেয়েও মারা যায়নি কেউ। স্থানীয় প্রতিটি বাড়িতেই তখন শরণার্থী। দু'জন তিনজন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার-পাঁচজন করেও। সেইসাথে বন্ধ স্কুল-কলেজ এবং কোর্ট-কাছারিও। এইসব প্রতিষ্ঠানের ভবনেও আশ্রিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থীরা। ১৬ লাখ ত্রিপুরাবাসীর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের ১৫ লাখ শরণার্থী। তখন হিন্দু–মুসলমানের কোনো প্রশ্ন ছিলো না। ভেদ ছিলো না জাত-পাতের, ভারত বা বাংলাদেশের। তাদের সবারই তখন একটি মাত্র পরিচয় ছিলো আমরা বাঙালি। শুধু ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দাদের কথাই বা বলি কেনো, পাহাড়-কন্দরের অধিবাসীরাও তাদের বাড়িঘরে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত শরণার্থীদের। এইভাবে ১৯৭১-এর পুরো ন'মাস ত্রিপুরা হয়ে উঠেছিলো মহামানবের মিলন বা তীর্থক্ষেত্র। এই আত্মিক মেলবন্ধনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টিকে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। যুগিয়েছিলো বাঙালি জাতিকে প্রেরণা, দিয়েছিলো সাহস। বিপদের দিনের সেই বন্ধুত্ব আজ ইতিহাস।

কতো কথা বলবো, বলে শেষ করবার নয়। হয়তো সব কথা বললে আত্মগর্বের মতো শোনাবে। নিজের ঢাক নিজে পেটাবার মতো মনে হবে।

আগরতলা শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে শালবাগানে গড়ে তোলা হয়েছিলো গেরিলা বাহিনীর আহত সদস্যদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয় অকৃপণভাবে বহন করতেন গুলজারীলাল

নন্দের অনুগত শ্রী বংশীলাল। এ ব্যাপারে শ্রী বংশীলাল নন্দী আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন হরিয়ানায়। তার কথা সত্যিই ভুলবার নয়।

বাংলাদেশের একটি গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল সুবেগ সিং। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ওই গেরিলা দলটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্রবাহী একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিলো। এই অপারেশনের সময়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অর্থাৎ অথৈ সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছিলেন ১৫ জন গেরিলা সদস্য। চারদিক থেকে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে সেদিন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন তারা। এই লড়াই হয়েছিলো বঙ্গোপসাগরে।

এর পরের ঘটনাতো সবারই জানা। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়, হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত পরাজয়, ভারতীয় বাহিনীর ভূমিকা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ততোধিক সাহসী অভিযান–সবই নিকট অতীতের ঘটনা। মনে হয়, মাত্র গতকালকে ঘটে গেছে সবকিছু। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় ভারতবাসীর সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীরও গর্বিত বিজয়ের ঘটনা হয়ে উঠেছিলো।

জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন ইসলামাবাদের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে পা দেবার আগে দিল্লিতে নেমেছিলেন, সেদিন সাংবাদিকদের কাছে তিনি অকপটে বলেছিলেন, "I am indebted to Tripura and It's chief Minister Mr. Singh." আমার বুক সেদিন ভরে গিয়েছিলো। প্রত্যেকটি ত্রিপুরাবাসীরও বুক ভরে উঠেছিলো গর্বে এই মহান নেতার ওই উচ্চারণে।

ঢাকায়, স্বদেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। সরাসরি গাড়িবহর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগরতলায়। আমরা রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সেই তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছিলাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ—প্রতিটি কোণে পাকবাহিনীর ধ্বংসের স্বাক্ষর। এই রকম সফরেরই এক পর্যায়ে অবসর মতো বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, "নতুন দেশ, নানা বৈরী শক্তি আপনার চারদিকে। সাবধানে থাকবেন।" তার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "দাদা আমাকে কেউ মারবে না।" এই রকম নির্ভীক আর আত্মপ্রত্যয়শীল উচ্চারণ করেছিলেন যিনি, সেই মহৎপ্রাণ মানুষটিই শেষ পর্যন্ত নিহত হন মর্মান্তিকভাবে প্রায় গোটা পরিবারসহই। নিহত হয়েছেন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের, আগরতলার মাটি যাঁদের পদস্পর্শে একদিন ধন্য হয়েছিলো, আরো ৪ শীর্ষস্থানীয় নেতা তাজুউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী, কামারুজ্জামান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এইসব স্মৃতি, টগবগে স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি আজো বেঁচে আছি।

কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক। তবে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। পাকিস্তান আর্মিতে যোগ দিয়ে বুঝতে পারি, কীভাবে তারা আমাদের বঞ্চিত করছে, প্রভুত্ব করছে। নিজেদের মধ্যে যাই থাক, বাঙালিদের শোষণের বেলায় পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ, পাঠান আর বিহারি সবাই এক জোট হয়ে যেতো। They used to think us as lesser human being, lesser Muslims. They were critical on our every aspect of life and living.

বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের এই আচরণ আর মনোভাবের জন্য আমাদেরই কিছু নতজানু, অনুগত রাজনীতিবিদ, এলিট এবং বুদ্ধিজীবীই দায়ী। এঁদের কারণেই ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সময় বাংলাদেশ তার ন্যায্য ভৌগোলিক অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এঁদেরই জন্য পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

একসময় আমি জয়দেবপুরে ছিলাম। একদিন সামরিক শরীরচর্চা শেষে প্রায় ৭/৮ জন অফিসার কাছাকাছি করটিয়া পন্নী সাহেবদের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। আমি ছাড়া বাকি সবাই পাঞ্জাবি। এতগুলো পাঞ্জাবি অফিসারকে দেখে ওরাতো ভীষণ খুশি। বৃদ্ধ পন্নী সাহেবদের একজনতো পাঞ্জাবিদের তুষ্ট করতে করতে বলেই বসলেন, তাঁরা আসলে এখানকার লোক নন। ইরান-তুরান থেকে এদেশে এসেছিলেন এবং বাঙালিদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা, ওরা মাত্র দু' পুরুষ আগেকার মুসলমান।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে ছিলাম (পুরো শহরে আমিই একমাত্র বাঙালি)। এ.আর.এস. দোহা

সম্পাদিত Interwing পত্রিকার মাধ্যমে চলমান গণঅভ্যুত্থানের সব খবরাখবর পেতাম। শেখ সাহেব, তোফায়েল এঁদের বক্তৃতা আমাকে অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত করতো। 4E Bengal Regiment মার্চের (৭১) আগে ছিলো কুমিল্লাতে। পাকিস্তানি সরকার তাদের diabolical plan কার্যকর করার সুবিধের জন্য ব্যাটেলিয়ানকে মার্চের ১ তারিখে Disperse করে দেয়। আমার কোম্পানির নাম ছিলো ডেল্টা কোম্পানি এবং ১ মার্চে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার অজুহাতে আমাকে আমার কোম্পানিসহ পাঠানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এছাড়াও চার্লি কোম্পানিকে পাকিস্তানি মেজর সাদিক নেওয়াজের নেতৃত্বে আমার সঙ্গে দেয়া হয়। ওদিকে ২৩ মার্চ সকল অনুপ্রবেশ ঠেকানোর মিথ্যে অজুহাতে মেজর খালেদ মোশাররফকে একটি কোম্পানি দিয়ে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়। হেড কোয়ার্টার থেকে সবগুলো কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়া হয় সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে।

৩ মার্চের পর দেশের পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যায়। সে সময় রেডিওতে একটা দেশাত্মবোধক গানের (পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে ...) সুর কিছুক্ষণ পরপর বাজানো হতো যার আবেদন আমার মতো অনেকেরই রক্তে দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো। মারাঠা বর্গিদের মতো পাকিস্তানি তস্করদের পরাভূত করে জাতিকে শোষণ এবং শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য আমিও অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পর ঐ গান রেডিও-টিভি থেকে সম্প্রচারের ব্যাপারটি সুকৌশলে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর কখনো শুনিনি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ৮ মার্চ তারিখে রেডিওতে শুনি। তখন মনে করেছিলাম, তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এখন মনে করি, তিনি তখন ঠিকই করেছিলেন। Statesmanship-এর পরিচয় দিয়েছিলেন। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরাও ঐ দিন অস্ত্র হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত ছিলাম। প্রস্তুত ছিলাম মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়ার ব্যাপারে। ৭ তারিখে তাই আশাহত হয়েছিলাম।

'৭১ সালে পাকিস্তানিরাই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে আমাদের বাধ্য করেছে। তারা আক্রমণ না করলেও বঙ্গবন্ধু কালক্রমে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। শুধু একটা ঘোষণার দরকার ছিলো। সাধারণ সৈন্যরা তো তৈরিই ছিলো। অফিসাদের মধ্যে লেঃ কবির, লেঃ হারুন, আমি ও খালেদ মোশাররফ তো Mentaly prepared-ই ছিলাম।

অবশ্য আমি 4E Bengal-এর কথাই বলছি, অন্যের কি চিন্তাচেতনা ছিলো, বলতে পারবো না। মার্চ মাসের সম্ভবত ৭/৮ তারিখের দিকে (বঙ্গবন্ধুর ভাষণের

পর) সেই সময়কার একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসার কর্নেল সালাহউদ্দিন রেজা ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি সে সময় ঢাকায় আর্মি রিক্রুটিং অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমাকে জিগ্যেস করেন, arms এবং ammunition কেমন আছে ? সামনে দিন আসছে, এগুলো কাজে লাগবে ইত্যাদি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, সৈনিকদের alertnss আর মনোবল দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন সেদিন। ঢাকা থেকে অসম্ভব কষ্ট করে কেবল পায়ে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছিলেন কর্নেল সালাহউদ্দিন। জেনারেল ওসমানীর ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি।

৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট তখন সিলেটের খাদিমনগরে ছিলো। ১১ মার্চ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় রসদ (রেশন) বোঝাই ট্রাক এসকর্ট করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেটে ব্যাটেলিয়ান পৌছে দেয়ার। কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার কাছে রসদ আসতে সময় লাগতো দু' দিন আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেটে—এই ১২০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে যেতে সময় লাগতো তিনদিন। আমার সাথে এক প্লাটুন (৩৫ জন) সৈন্য ছিলো। সেই সৈন্যসহ যেতে যেতে রাস্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই বিশাল বড়ো বড়ো গাছের ব্যারিকেড চোখে পড়লো। সাধারণ মানুষ পাকিস্তানিদের জন্য রসদ নিয়ে যেতে দেবে না। আমি ও আমার সঙ্গী সৈন্যরা সংগ্রাম কমিটির সদস্য ও সাধারণ লোকদের বোঝালাম যে, রসদ না পৌছে দিতে পারলে আমাদের বন্দী করে কোর্ট মার্শাল করা হবে। সময় মতো আমরা অবশ্যই পাশে এসে দাঁড়াবো।

মার্চের ১৬ তারিখে আমরা সিলেট পৌছে দেখি ৩১ পাঞ্জাবের অধিনায়ক তার সৈন্যদের নিয়ে ব্রিফিং (দরবার) করছেন। সেখানে আমাদের যেতে দেয়া হলো না। আমাদের সব অস্ত্র তাদের অস্ত্রগারে জমা দিয়ে সৈন্যদের লাইনে দাঁড়াবার এবং আমাকে অফিসার্স মেসে থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। আমাদের জোয়ানরা পাকিস্তানিদের মতলব প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিলো। সিনিয়র NCO-রা আমাকে বললেন যে, আমরা Operational area থেকে আসছি। আমাদের অস্ত্র দিয়ে আমরাই ছোটোখাটো অস্ত্রাগার বানিয়ে রাখবো। আমি পাকিস্তানিদের এই সিদ্ধান্ত জানালে তারা আর বেশি উচ্চবাচ্য করলো না। আমাকে বলা হলো একটা অর্ডার আসছে। Unofficially বলা হলো যে, সিলেটে বিভিন্ন চা-বাগানে কর্মরত অবাঙালি অফিসারদের family escort করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাদের জড়ো করতে সময় লাগছে এবং সে পর্যন্ত আমাদের ৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গেই থাকতে হবে।

পরদিন (৭ মার্চ) আমার প্রতি কি অর্ডার আছে জানতে চাইলাম; কিন্তু কেউই কিছুই বললো না। কুমিল্লায় আমাদের ব্যাটালিয়ান অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেয়া হলো না। শেষে কুমিল্লার বাঙালি সুবেদার মেজর

ইদ্রিসের সাথে টেলিফোনে কথা হলো। তাঁকে বললাম, কিছু বুঝতে পারছেন ইদ্রিস সাহেব ? এরা আমাকে কোনো অর্ডারও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না । সুবেদার মেজর উত্তর দিলেন, স্যার, সবই বুঝছি। আপনি কিছু বলবেন না, আমি সি.ও সাহেবকে বলব যেনো আপনাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে আসেন। অধিনায়কের ওপর একজন সুবেদার মেজর প্রচুর influence খাটিয়ে থাকেন। যাহোক, সি.ও কুমিল্লা ব্রিগেড কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসবার নির্দেশ দেন। ১৯শে মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসি। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় 4E Bengal Regiment-এর বাকি একটি কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টার কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একটি ছাড়া সবগুলো কোম্পানি একত্র করে। কেবল খালেদ মোশাররফের কোম্পানি তখন শমসেরনগরে।

আমরা 4E Bengal Regiment-এর প্রায় সব বাঙালি অফিসার ও সৈন্য সেই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। খালেদ মোশাররফ ২৩ মার্চ রাতের খাবারের সময় আমাকে বললেন, পাকিস্তানিরা পার্লামেন্ট বসতে দেবে না, ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। একটা genocide ঘটানোর পরিকল্পনা চলছে। আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। Civilian–এর বেশে PIA-এর মাধ্যমে বেশকিছু পাকিস্তানি ব্যাটেলিয়ান ঢাকায় এনেছে তারা এবং অস্ত্রশস্ত্রও এসেছে জাহাজে করে। Crack down হবেই এবং তাহলে বাঙালি Troops-দের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত violent reaction দেখা দেবে। তাই তারা আগে বাঙালি Troops-দের disarm করে ফেলার চক্রান্ত করছে। খালেদের এই চেতনাটা বাংলাদেশের সেই সময়কার চাকরিরত মোটামুটি অনেক অফিসারের ভেতরেই অনুপস্থিত ছিলো। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধে, প্রথম পর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) মাত্র ২৫ থেকে ৩০ জন বাঙালি অফিসার (পাক সেনাবাহিনীতে চাকরিরত) সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। যদিও তখন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন বাঙালি অফিসার কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কিছু কিছু বাঙালি অফিসার বিভিন্ন কাজে ঢাকায় এসে আবার পাকিস্তানে ফিরে যান। এদিক দিয়ে অফিসারদের তুলনায় সাধারণ সৈন্যদের ভেতরেই সংগ্রামী চেতনা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এই চেতনা ও দূরদৃষ্টির অভাবেই বহু বাঙালি অফিসার অসহায় বন্দী ও পরবর্তীকালে নিহত হন। খালেদ মোশাররফ ২৩ মার্চ রাতে শমসেরনগর যাওয়ার পথে আমাকে একটা নির্দিষ্ট ঘধরণফগ্র Wireless দিয়ে বলেন, কোনো কিছু হলে ঐ Frequency-তে আমি যেনো যোগাযোগ করি। তারপর ২৫ তারিখে crack down হলো। ২৬ মার্চ Wireless set দিয়ে random scanning করার সময় আমরা পাকিস্তানি আর্মির একটা স্টেশনের সঙ্গে আরেকটা স্টেশনের মধ্যে পরিচালিত উর্দু কথাবর্তা শুনতে পাই। সেখানে বলা হচ্ছিলো

১. আরো tank ও ammunition দরকার।

২. হেলিকপ্টারে air lift দরকার এবং Heavy casualty হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই দিনই বিকেলে রেললাইন দিয়ে পায়ে হেঁটে এবং লঞ্চে করে হাজার হাজার লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসে। তখন বুঝতে পারলাম, ঢাকাতে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

২৬ মার্চ বিকেল ৪টার দিকে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ হলে তাঁকে সব তথ্য দিই। তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, আমি রাতের অপেক্ষায় আছি। বুঝতে পারলাম, তিনি বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খুবই ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেশহীনভাবে নিয়ে ফেলেছেন। শমসেরনগর যাবার পর তাঁর withdrawl route পাকিস্তানিরা ৩১ Punjab-এর ১ নম্বর কোম্পানি সৈন্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলো। তাই তিনি চা বাগানের ভেতর দিয়ে বিকল্প রাস্তা ধরে পরদিন অর্থাৎ ২৭ তারিখে বেলা প্রায় ২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌছান।

২৫ তারিখ রাত ৯ টার দিকে অত্যন্ত সাহসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ৩ জন NCO আমার কাছে আসেন। এঁরা ছিলেন হাবিলদার বেলায়েত, হাবিলদার শহীদ ও হাবিলদার মনির। ঐ ৩ জন এসে আমাকে বললেন, তাঁরা আজ রাতে আমার তাঁবু পাহারা দেবেন। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করা তাদের কাছে ঐ মুহূর্তের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব বলে তারা মনে করেন। আমি বারণ করতে পারলাম না। হাবিলদাররা কখনো পাহারা দিতে পারে না। এটা সেপাইদের কাজ। আমি এর কারণ জিগ্যেস করলে তাঁরা বললেন, পাঞ্জাবিদের মতিগতি ভালো নয়। আজ রাতে আবার যদি তারা এখানে ঘেরাঘুরি করে তা' হলে আমরা ওদের মেরে ফেলবো। লেঃ কবিরও অত্যন্ত সর্তক ছিলেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পরামর্শ আমাকে সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই দু' টি সাহসী জুনিয়র অফিসারের ভূমিকা এবং কতর্ব্যবোধ জাতির প্রতি আমার দায়িত্ববোধকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি আমার সহধর্মিণী রাশিদা ৭ তারিখে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় চলে গিয়েছিলো। তিনিই ক্যান্টনমেন্টে কোনো সময় একটা ভয়ানক কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কা থেকে ২৪ তারিখে ঢাকা থেকে বহু কষ্টে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সতর্ক করে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন প্রস্তুত থাকতে এবং প্রয়োজনে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করতে। একজন গৃহবধূর এই চেতনা এবং দায়িত্ববোধের প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করে।

আমার সিদ্ধান্ত আমি অত্যন্ত সঠিকভাবে নিয়ে ফেলি। শুধু সময়ের অপেক্ষায় রইলাম। ২৬শে মার্চের রাতে আমি আমার Troops-দের Camp area-তে যাই। পাকিস্তান আর্মিতে অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিলো।

তাই সৈন্যরা কেউ অফিসারদের সাথে সহজে মনের কথা বলতো না। যা' হোক, সৈন্যরা তখন সেখানে বসে তাস খেলছিলো। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো এবং কয়েকজন আমার কাছে এসে বললো, স্যার, বাংলাদেশে যে কি হইতাছে তাতো জানেন। আমরাও সব বুঝি, জানি এবং খেয়াল রাখি। সময়মত ডিসিশন দিয়া দিয়েন, না দিলে আমগোরে পাইবেন না। যার যার অস্ত্র নিয়া যামুগা। জাতির দুর্ভাগ্য যে, সামরিক অফিসারদের সবাই এদের মতো এতো চেতনা, সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিলেন না বা সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। পারলে হয়তো মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ জন troops দিয়ে পাকিস্তানিদের পক্ষে চট্টগ্রামে আমাদের ২৫০০জন troops-কে কাবু করা সম্ভব হতো না এবং যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটা হতো না।

২৭ মার্চ সকালবেলা খবর পেলাম যে, সি.ও সাহেব সব অফিসারকে নিয়ে সকাল ৮টায় সভা করবেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, কী হতে যাচ্ছে? কারণ শেষ রাতেই কোম্পানিগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একজন অজ্ঞাতনামা দেশপ্রেমিকের কাছ থেকে এই খবর পাই যে, কুমিল্লা থেকে ১৪ ট্রাক সৈন্য আসছে। তখন আমি লেঃ হারুন, লেঃ কবির ও NOC-দের নিয়ে মালিক খিজির হায়াৎ খান ও সাদেক নেওয়াজকে বন্দী করে বিদ্রোহের ঘোষণা দিলাম। পাকিস্তানিদের বললাম, You have declared war against the unarmed people of our country, you have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances, we owe our allegience to the People of Bangladesh and the elected people's representative, you all are under arrest, your personal safety is my responsibility, but do not trv to influence others. C.O লেঃ কর্নেল খিজির হায়াৎ ও মেজর সাদেক নেওয়াজ চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়লেন। আমরা যখন C.O-র Tent-এর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন পুরো troops চুপচাপ বসে বসে তাঁদের ammunition load করছিলো এবং আমাদের movement-এর ওপর লক্ষ্য রাখছিলো। আমার Troops সেই ঘটনার পরপরই প্রথম জয় বাংলা শ্লোগান দিলো, যা তারা এতোদিন সিভিলিয়ানদের মুখ থেকেই কেবল শুনে আসছিলো।

৬০০ সৈনিকের সম্মিলিত কণ্ঠের এই শ্লোগান শুনে কয়েকজন পাকিস্তানি ও বিহারি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যেই তারা জনতার হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়। এর কয়েক মিনিট পর সেখানে প্রায় ১০/১৫ হাজার লোক চলে আসে। তাঁরা বন্দী ৩ জন পাক অফিসার ও ৩/৪ জন সিগন্যালম্যানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। একজন একটা Shot gun দিয়ে আকাশে গুলি করতে করতে আমার দিকে আসতে থাকে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানিদের হত্যা করা। সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি তাকে Sten gun-এর বাঁট দিয়ে প্রতিহত

করি এবং তাদেরকে বলি যে, এরা P.O.W অর্থাৎ Prisoner of war । সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক এদের প্রতি আচরণ করতে আমরা বাধ্য।

দুপুরের দিকে আমি SDPO-কে ডাকলাম এবং তার হাতে এদের তুলে দিয়ে বললাম, এদের যেন কেউ মারতে না পারে। কিন্তু তিনদিন পর তিনি আবার আমার কাছে এদের (পাকিস্তানিদের) নিয়ে এসে কান্নাভেজা গলায় বললেন, স্যার, আমাকে মারবেন না। আমি এই তিনদিন এদের তিন-চারটা থানায় নিয়ে গেছি Protective custoday-র জন্য ; কিন্তু যেখানেই যাই প্রায় ২০/২৫ হাজার লোক এদের মারার জন্য জমে যায়। এর ৩/৪ দিন পর আমরা তাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিই। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের PWO হিসেবে না নিয়ে Illegal border trespasser হিসেবে গ্রহণ করে।

বিদ্রোহের পরপর তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ সেপাইদের মধ্যে কোনো রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি। তবে কিছু Senior Jeo অসুস্থ হয়ে পড়েন, আবার কারো কারো তীব্র জ্বর দেখা দেয়। দু' একজন অফিসারেরও এ-রকম অবস্থা হয়েছিলো। পরবর্তীকালে তাঁরা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন এবং সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলা কাটবার পর বেলা প্রায় একটার দিকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততোক্ষণে পাকিস্তানিরা সব জেনে গেছে, ফলে যেকোনো মুহূর্তে air Strike-এর সম্ভাবনা ছিলো। তাই আমি আমার troops-দের আশপাশের গ্রামগুলোর বাঁশঝাড়ের আড়ালে-আবডালে চলে যেতে বলি। এমন সময় খালেদ মোশাররফ তাঁর অধীনস্থ একশো troopsসহ সেখানে উপস্থিত হন। আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন এবং 4E Bengal-এর দায়িত্বভার আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

এখানে একটা ভুল ধারণার(যা কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে অথবা ভুল করে সত্য বলে চালানোর চেষ্টা করছেন) নিরসন হওয়ার প্রয়োজন। আর সেটা হলো, এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে, ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও'র broadcast শুনেই 4E Bengal বিদ্রোহ ঘোষণা করে (হঠাৎ কোনো প্রিপারেশন ছাড়া আপনা আপনি), সেটা ঠিক নয়। ২৭ মার্চ রেডিও broad casting আমরা শুনিইনি এবং রেডিও শোনবার মতো অবস্থাও ছিলো না। নিজেদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। কখন তা প্রথম প্রচারিত হয়, তাও জানতাম না। মোদ্দা কথা, ২৭ মার্চ সকালেই আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিই এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের খবর ২৮/২৯ মার্চ টেলিফোনে অপারেটরের মাধ্যমে শুনি। মেজর জিয়ার বিদ্রোহের ঘোষণা আগে শুনলে হয়তো আরো বেশি অনুপ্রাণিত হতাম।

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, বীর প্রতীক

১৯৭১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস উদ্‌যাপন ছিলো সমগ্র জাতির ইতিহাসে একাত্মতা ঘোষণার আরেক ঐতিহাসিক দিন। এতো জাঁকজমক আর কোনোদিন হয়নি। ইকবাল হলে সকাল-বিকেল U.O.T.C ক্যাডেটদের কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ। সেই উদ্দীপনা, সেই জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা আজ নেই। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার দিন থেকেই আরম্ভ হয় একটা রণউন্মাদনার। U.O.T.C-র রাইফেল দিয়ে আরম্ভ হয় প্রশিক্ষণের পালা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হলো ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই অনুযায়ী আরম্ভ হলো কাজ।

২৪ মার্চ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আহত হই। এলো ২৫ মার্চ। বিকেলে অনেক কেন্দ্রীয় নেতাই সংবাদ পেয়ে দেখতে এলেন। রাতে ১১টার সময় বঙ্গবন্ধুর ফুফাত ভাই ধানমণ্ডি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শাখাওয়াত ভাই এসে বললেন, আলোচনা ভেঙে গেছে, সংগ্রাম করেই অধিকার আদায় করতে হবে। রাস্তায় আর্মি নেমেছে, বেরিকেড দাও। অসুস্থ অবস্থাতেই মা আমাকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন। ফারুক এলো। গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারের সিঁড়িতে আমার মায়ের সাথে বসে আছি। আমার নির্দেশে গ্রিন রোডের ছেলেরা বেরিকেড তৈরিতে ব্যস্ত। তিনটা বেরিকেড হওয়ার পর আরম্ভ হলো সেই কালো রাতের ভীষণ গোলাগুলি। সবাইকে চলে যেতে বললাম। তারপর অপেক্ষার পালা। শেষ রাতে আর্মি এলো গ্রিন রোডে। ঠেলাগাড়িওয়ালা, রিকশাওয়ালা আর দিনমজুরদের ধরে ধরে বেরিকেড সরাতে বাধ্য করলো ওরা। যাবার সময় সেই চারজনকে ওরা সেই বেরিকেডের আবর্জনার স্তূপের ওপরেই গুলি করে মেরে রেখে গেলো। ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত ছিলো কারফিউ। সকালবেলা কারফিউ ব্রেক দেয়ার পর আরম্ভ হলো আমার জীবনের

নতুন এক অধ্যায়।

২৭ মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেয়া হলে মা, আমি, আমার ছোট দুই বোন আর এক ভাইকে নিয়ে শহীদ বন্ধু লেঃ আজিজুল ইসলামদের (বাবুল) গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের বানিয়ারাপাড়ায় পালিয়ে যাই। ১ এপ্রিল পর্যন্ত বানিয়ারাপাড়ায় থাকি। ২ এপ্রিল আমি, মা ও ভাইবোনদের নিয়ে একটি ছোট গাড়িতে করে ঢাকায় রওনা হই। মির্জাপুরে আসার পর আর্মি কনভয়ের সামনাসামনি হলাম। মা পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এক ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলার পর তারা আমাদের ছেড়ে দেয়। সেই সাথে একটা পাস দিয়ে দেয় যাতে রাস্তায় কোনো রকম অসুবিধে না হয়।

সেই রাতটা ঢাকাতে অন্য বাসায় অতিবাহিত করে পরেরদিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল নরসিংদী হয়ে কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার বীটগড় গ্রামে মামার বাড়ি চলে যাই। গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে দেখেছি হাজারো মানুষের শহর থেকে পালানোর হিড়িক। পথে পথে দেখেছি শত শত শবের স্তূপ আর সেগুলোকে নিয়ে শকুনের পালের কাড়াকাড়ি। পাশাপাশি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সে কী আর্তি ! বিস্ময়চিত্তে দেখছি গ্রামের মানুষ কীভাবে অসহায় ভিটেছাড়া মানুষজনকে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করছে। বাঁচবার আর বাঁচাবার সেই ছবি বাঙালি জাতির জীবনে দেশাত্মবোধের এক নজিরবিহীন ঘটনা।

৩ এপ্রিল গ্রামে পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে সবাই এলেন দেখা করতে। সবার মুখে একটাই কথা, ঢাকার খবর কি ? অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা হলো। স্থির হলো আগামীকাল থেকে আমরা কাজে নামবো। কাজ হলো গ্রামে গ্রামে যুবক ও অন্যদের সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা। সেই সাথে সবাই প্রস্তুত থাকা, যাতে যে কোনো সময় কোনো নির্দেশ এলে সেই মোতাবেক কাজে যোগ দেয়া যায়।

সময়টা ছিলো বিরামহীন পরিশ্রম আর উন্মাদনার। সারা এপ্রিল মাসটাই একইভাবে কাজ করে গেছি। আমার সাথে যাঁরা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে, আজো মনে পড়ে, রূপন মাস্টার (বীটগড় হাইস্কুলের শিক্ষক), মানিক ডাক্তার, খুরশীদ ভাই আর নসু ভাই-এর কথা। পরবর্তীকালে এরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই রূপন মাস্টার যদি না থাকতেন, তবে অনেক মুক্তিযোদ্ধারই হয়তো বা ভারতের মাটিতে যাওয়া হতো না বা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সাধ মিটতো না। রূপন মাস্টারের লোকেরাই নৌকো করে মুক্তিযোদ্ধাদের সিএণ্ডবি রোড পার করে দিতো। আবার রাজাকাদের সাথে যোগাযোগ করে সিএণ্ডবি-র ওপার থেকে আরেক গ্রুপ রাতের আঁধারে একেবারে ভারতে পৌঁছে দিতো। এভাবেই তিনি অনেক বড়ো বড়ো কাজ করেছেন। বিনিময়ে কিছুই চাননি, বিন্দুমাত্র প্রতিদানও। অথচ আজ এই ত্যাগী কর্মীরাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে

গেছেন। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে আজ গড়া হয় ইতিহাস রচনা কিংবা পালাগান। কিন্তু এদের কথা, যাদের জন্য বীরেরা তাদের সাফল্য পায়, তাঁদের ত্যাগের কথা থেকে যায় সবার অগোচরে।

যাহোক, জীবন বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার মানুষ তখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের আগরতলার দিকে ছুটে যায়। আমার মামার বাড়ি বীটগড় থেকে আগরতলার দূরত্ব ১০/১২ মাইল। এইটুকু পথ শরণার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে আর রাস্তা চেনার ব্যাপারে যাতে ভুল না হয়, সে ব্যাপারটা দেখাই ছিলো আমাদের সংগঠনের অন্যতম কাজ। এরই মাঝে ঢাকা কলেজের ছাত্র হাসান মাহ্মুদের (পরবর্তীকালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) সাথে গ্রামের বাজারে দেখা। সময়টা বোধ করি এপ্রিলের শেষ ভাগ। ও আমাকে ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক মাখন ভাইয়ের একটা চিঠি দিলো। চিঠিটা আমার উদ্দেশ্য আগরতলার কলেজ টিলা ছাত্রাবাস থেকে লেখা। আমাকে যেতে বলেছেন। যাহোক হাসানকে নিয়ে বাড়ি এলাম। রাতের বেলা সব কথা মাকে খুলে বলতেই উনি নির্দেশ দিলেন, যাও।

পরদিন মণিঅন্ধ গ্রামের নাসিমকে নিয়ে চারগাছ, মণিঅন্ধ আর কসবা হয়ে আখাউড়া চেকপোস্টে গেলাম। ওখানে দেখা এম.এন.এ দেওয়ান আবুল আব্বাসের সাথে। তিনি আমাকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে একজন লোকসহ পাঠালেন আগরতলার শ্রীধর ভিলায়। ওখান থেকে চলে এলাম কলেজ টিলায়। ৮/১০ দিন সেই ছাত্রাবাসে থাকার সময় অনেকের সাথেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে এবং অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। একদিকে গ্রামের সাধারণ অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত ছেলেদের মুখে নিরন্তর প্রশ্ন, এখন আমাদের কি করণীয়, আমাদের কি হবে ? আবার পাশাপাশি দেখেছি একদল শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেকে যারা কাপড়ে-গায়ে সেন্ট মেখে, দামী পোশাক-আশাক পরে ছবিপাড়ায় গিয়ে ছবি দেখে সময় পার করতে, গল্প-গুজব করে নিরুদ্বিগ্ন সময় পার করে দিতে। অবাক হতাম এদের দেখে।

৮/১০ দিন পর মেজর খালেদ মোশাররফ এলেন লেঃ কবিরকে সাথে করে কলেজ টিলার মাখন ভাইয়ের রুমে। মাখন ভাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সব আলাপ-আলোচনা শুনলাম। জানতে পারলাম, ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা দল গঠন করা হবে। আমি যুদ্ধে যোগ দেয়ার আগ্রহ দেখাতেই খালেদ মোশাররফ সাহেব মাখন ভাইকে বলে গেলেন আমাদের পাঠিয়ে দিতে। মে মাসের মাঝামাঝি সকালবেলা কলেজ টিলার সবাইকে ডেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো। এই সময় কলেজ টিলায় আশ্রয়গ্রহণকারী আমাদের সংখ্যা প্রায় ৮০/৯০ জনের মতো। এর ভেতরে ৪০/৫০ জন তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করলো। অবাক হলাম, যারা আগ্রহ ব্যক্ত করলো, তাদের সবাই গ্রামের অরাজনৈতিক অর্ধ ও অশিক্ষিত তরুণ-যুবক। যারা যেতে

চাইলো না তারা সবাই শহরের শিক্ষিত অবস্থাপন্ন আর রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পরে এদের কেউ কেউ মুজিব বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।

যা' হোক সন্ধ্যার পর একটা ট্রাকে করে আমরা মতিনগর B.S.F ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়ে রাত প্রায় ১০ টায় সেখানে পৌছি। রাত বলে আমাদেরকে পরদিন যাবার কথা বলে বিদায় দেয়া হলো। চলে এলাম সোনামুড়া। সারারাত সোনামুড়া হাইস্কুলে শুয়ে-বসে সময় কাটিয়ে পরদিন ৬ মাইল পথ হেঁটে মতিনগর B.S.F ক্যাম্পে পৌছালে ওখান থেকে পথনির্দেশককে নিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে বাংলাদেশ আর্মি ক্যাম্পের আউট পোস্টে এলাম। বেলা প্রায় ৩টার দিকে লেঃ দিদারুল আলম এলেন এবং সবার সাথে আলোচনা শেষে বাছাইপর্ব শেষ করলেন। আমার ছেলেদের ভেতর থেকে ৬/৭ জন বাদ পড়লো। বাদ পড়ার দুঃখে শুরু হলো ওদের আহাজারি। এই রকম অবস্থার মুখোমুখি হয়ে ওদের জন্য অনুরোধ করতে গিয়েও কোনো কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সন্ধ্যার সময় হেঁটে ক্যাম্পে পৌছুলাম। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো আরেক বিস্ময়। আমার ছোটোবেলার খেলার সাথী নজরুল, হেলাল, মন্টু আর হায়াৎ সেই ক্যাম্পে আগে থেকেই অপেক্ষা করে বসে ছিলো আমার জন্যে।

পরদিন সকাল থেকেই আরম্ভ হলো প্রশিক্ষণ জীবন। সকালবেলা পুরি খাওয়া শেষ হতে না হতেই 'ফল ইন'-এর ডাক। সবাই গিয়ে দাঁড়াতেই আরম্ভ হলো মাথা-গোনা। এর মধ্যে এলেন মেজর শাফায়াত জামিল সাহেব। এক এক করে আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে সবাইকে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ ও কর্তব্য সম্পর্কে। তারপর এলো গ্রুপ ভাগের পালা। তখন আমাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১০০। শাফায়াত জামিল সাহেব জানতে চাইলেন, আমাদের ভেতর থেকে কে কে কমাণ্ডার হতে ইচ্ছুক। এটা শুনে যাঁরা হাত ওঠালো, তিনি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। আমি হাত ওঠাইনি; কিন্তু আমার বন্ধুরা আর যাদের আমি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই ছেলেরা সবাই সমস্বরে আমার নাম বলে আমাকে এক ধাক্কায় লাইনের সামনে ঠেলে দেয়। জামিল সাহেব আমার সমস্ত পরিচয় জেনে আমাকে Company Commander হিসেবে নিয়োগ করেন। আমার টু আই সি নিযুক্ত করেন সালাহ উদ্দিনকে আর Adjutant নিযুক্ত হয় মঞ্জুর-এ মওলা। এছাড়া ছেলেদের চার ভাগে ভাগ করে গঠন করা হয় ৪টি প্লাটুন। এরপর আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় মনির ওস্তাদের সাথে। তিনি আমাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত।

পরদিন থেকে শুরু হলো আমাদের গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ নিয়ে প্রশিক্ষণ। এভাবে ১০/১২ দিন কেটে গেলো। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু Activity করার প্রয়োজন আছে দেশের ভেতরে। কেননা মোটামুটি পাকবাহিনী

তখন বর্ডার এলাকাগুলোতে কিছু কিছু Activity-র সম্মুখীন হচ্ছে। ঢাকা শহর বা এর আশপাশে তখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। সেই সাথে, মুক্তিযোদ্ধা, যারা প্রশিক্ষণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে ফিরে যাবে, তাদের আশ্রয়, আহার সংস্থান করা ও অগ্রিম তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশের ভেতরভাগে পকেট সৃষ্টি করার চিন্তার ফলে জন্ম হলো VF বা ভিত্তি ফৌজের। এদেরকে সরবরাহ করা হলো গ্রেনেড, কিছু এক্সপ্লোসিভ আর প্রত্যেকের জন্য দেয়া হলো commando knife। প্রথম Sector and Head quarter (মতিনগর) থেকে যে দলটা বাংলাদেশে যায়, সেই দলে ছিলো নজরুল, হায়াৎ, জলিল, হেলাল আর মন্টু। সাথে আরো প্রায় ২০/২২ জন। এদের সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো হলো। এরা আমাদের অনেক কাজে আসে।

এর মাঝেই এলেন আমাদের ছাত্রদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ক্যাপ্টেন হায়দার, যিনি পরে, যুদ্ধের শেষ ভাগে মেজর পদে উন্নীত হন। উনি আসার পর আমাদের ট্রেনিং আরো সুসংগঠিত ও গতিবেগ অর্জন করে। পিডিবি'র ইঞ্জিনিয়ার মমিনুল হক ভুঁইয়া মারফত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর এলো, ঢাকায় আমাদের কিছু অপারেশন করতে হবে, কেননা জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল ৭ জুন ঢাকায় আসবেন, ওদের সামনে প্রমাণ করতে হবে, আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধিকার আদায়ের জন্য লড়ছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে এদেশের মাটিতে। এটা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করতে হবে। সে মোতাবেক মোট ১০টি দল গঠন করা হলো। প্রত্যেকটি দলে সদস্য সংখ্যা ৪। ভুঁইয়া ও হায়দার সাহেবের প্ল্যান অনুযায়ী ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেক গ্রুপকে ৪টা গ্রেনেড, ৩০ রাউণ্ড করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর একটি করে স্টেনগান দেয়া হলো।

৬ জুন মনতলি ক্যাম্প হয়ে আড়াইহাজার থানার গোপালদিতে এম.পি সফর আলী সাহেবের বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ১০টি দলে ভাগ হয়ে যার যার Place of Action-এর দিকে রওনা হলাম। প্রত্যেককে একটি করে টার্গেট সেই সাথে একটি করে alternative টার্গেট দেয়া হয়েছিলো। আমার দলে এলো মাতুয়াইলের অলি, ঢাকার বাবুল, আজিজুল ইসলাম (বাবুল) (লেঃ শহীদ হন পরে কসবায়)সহ আরো একজন, তার নামটা মনে নেই। আমাদের ওপরে নির্দেশ ছিলো যাত্রাবাড়ির ইলেকট্রিক সাবস্টেশন ধ্বংস করা। রাত ১২টার দিকে যাত্রাবাড়ি সাবস্টেশনে পৌঁছে দেখলাম ক্যাম্পে প্রায় ২০ জন আর্মি। দু'টি LMG Post । আমাদের মাত্র একটি স্টেনগান। বাধ্য হয়েই যেতে হলো Alternative টার্গেটের দিকে। সায়েদাবাদ ব্রিজের নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া মেইন ইলেট্রিক ক্যাবল লাইন—সেটাই হলো আমাদের টার্গেট।

আমরা সন্তর্পণে এক্সপ্লোসিভ লাগালাম। যাহোক অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্ত

এক্সপ্লোসিভ (৩০ পাউণ্ড) লাগিয়ে Time Fuse-এ আগুন দিয়ে ছুট। অনেক দূরে ছুটে এলাম, তবুও বিস্ফোরণ হচ্ছে না। ফিরে যাব কি না ভাবছি, এমনি সময় বিদ্যুৎ চমকের পর ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, যার ধাক্কায় আমরা ৪ জনই পপাত ধরণীতল। ৫ পাউণ্ড হলেই কাজ হতো অথচ দিয়েছিলাম ৩০ পাউণ্ড। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সায়েদাবাদ ব্রিজে মারাত্মক ফাটল ধরে যায়। ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। এরপর আমরা পালিয়ে যাই।

পরদিন ঢাকায় ঢুকতে গিয়ে দেখতে পাই ব্রিজের ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। ব্রিজ ফেটে তিনটা মারাত্মক ছিদ্র হয়েছে। ঢাকায় দু'দিন থেকে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। এর ভেতরে আমাদের জন্য ভারত সরকার অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ করলো। মতিনগর থেকে রুদ্র সাগরের কাছে মেলাঘরে ক্যাম্প স্থানান্তর করতে হলো। অনেক খাটাখাটির পর জঙ্গল পরিষ্কার করে ভারতীয় ঠিকাদারদের সহায়তায় গড়ে তোলা হলো মেলাঘর ক্যাম্প।

ট্রেনিং প্রোগ্রামেও অনেক পরিবর্তন এলো। ট্রেনিং পুরোদমে চলছিলো। ক্যাম্পে নতুন নতুন ছেলে যোগ দেয়াতে আমাদের সংখ্যা বাড়লো। প্লাটুন সংখ্যা ১৬-তে উন্নীত হলো। ৭ নম্বর প্লাটুনের সব ছেলেই ঢাকা শহরের, যার কমাণ্ডার ছিলেন মায়া, বীর বিক্রম।

অনারারি ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার, বীর প্রতীক

২৬ এপ্রিল পাকবাহিনী পাক্কা ১০ ঘন্টা হামলা চালায়। ফলে এ. কোম্পানি তেলিয়াপাড়ায় ফিরে আসে। ২৪ এপ্রিল মেজর শফিউল্লাহ্ আবার তেলিয়াপাড়ায় সভা ডাকেন। ৩০ এপ্রিল সেখান থেকে হেড কোয়ার্টার সিমলাতে সরিয়ে নেয়া হয়। ডি. কোম্পানি ঐদিনই কলকালিয়া যায় এবং সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোকেশন নির্ণয় করে। ডি. কোম্পানির কমাণ্ডার মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী আমাকে হুকুম দিলেন, লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিফেন্স গড়তে। এলাকাটা পাক-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য বিখ্যাত। এখানেই মেজর তোফায়েল শহীদ হন। তার নামে একটা স্মৃতিসৌধ ঐ গ্রামে আছে। পাকসেনাদের ওপরে আদেশ ছিলো যে ঐ গ্রামে এসে তোফায়েলের স্মৃতিফলক দখল করার। আমাদের সাহসিকতা ও মনোবলের জন্য ওরা সেটা দখল করতে পারেনি। দুটো হেভি মেশিনগান এবং দুটো টু ইঞ্চি মর্টার এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করে। আমি ঐ সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পেতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেক ক্ষতি করি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেটগামী রেললাইন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেটের পাকা সড়ক আমাদের দায়িত্বে ছিলো। পাকসেনারা ট্রেন এবং বাসে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেটে যাতায়াত করতো। আমাদের লক্ষ্য ছিলো তাদের এই যাতায়াত বন্ধ করা। ফলে আমরা সিলেট এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়াগামী ট্রেন ও ব্রিজের ক্ষতি করি। পাঁচগাঁও ব্রিজ, হরেসপুর ব্রিজ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-সিলেটগামী সড়কের ওপর মাদমপুর ব্রিজ, চান্দ্রা ব্রিজ এবং বুজুন্দী গ্রামের ব্রিজ ধ্বংস করি। পাওয়ার হাউসসহ বিজলী সাপ্লাই পয়েন্ট ও কোয়ার্টার সাপ্লাই পয়েন্ট ধ্বংস করি। এ জাতীয় অন্তর্ঘাতের একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, আর তা হলো, বর্বর পাকসেনাবাহিনী যেনো সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সিলেট যেতে এবং আমাদের ওপর সারাসরি আক্রমণ না চালাতে পারে। তাদের

চলার পথে ও রাস্তায় ফাঁদ পেতে কেঁচকি মার দেয়া ছিলো আমাদের উদ্দেশ্য। আমার অপারেশনের এরিয়া ছিলো চান্দ্রা, কালিশিমা, মাধবপুর, হরেসপুর, বুল্লাগ্রাম, পাইকপাড়া, পাঁচগাঁও এবং ইসলামপুর। কোম্পানি হেড কোয়ার্টার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ছিলো। আমি ঐ গ্রামে অবস্থান করে মে থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ঐ দায়িত্বে থাকি।

এই সময় হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ আসে, আমাদের বেলুনিয়া যেতে হবে। আমি সেক্টর ফোর্সকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ১ নভেম্বর ফোর্স নিয়ে ইণ্ডিয়ান গাড়িতে চড়ে ডি. কোম্পানির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের অধিনায়কত্বে বেলুনিয়ায় রাত ৮টায় পৌঁছি। ঐ এলাকাটা ছিলো আমাদের জন্য অজানা-অচেনা। ওখানে অধিনায়ক ছিলেন মেজর জাফর ইমাম সাহেব। তাঁর কাছে আমরা রিপোর্ট করি। ঐ তারিখেই আমার ওপর নির্দেশ হয়, আমি একা বেলুনিয়া ও চিতলিয়া গ্রামে রেকি করতে যাবো। একাত্তরের জুন মাসের ৪ তারিখে ঐ সেক্টরের একজন ইণ্ডিয়ান জেনারেল, একজন ব্রিগেডিয়ার এবং আমাদের সকল কমাণ্ডার অর্ডার গ্রুপ এবং রেকি গ্রুপ মিলে চিতলিয়া গ্রামে যাই। কারণ জুলাইয়ের ১১ তারিখে আমাদের অপারেশন করার কথা। জুনের ৪ তারিখ বেলা ৪টায় নিজ নিজ এরিয়াতে পৌঁছি। ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ আমাকে হুকুম দিলেন, লেফট্ ফরোয়ার্ড প্লাটুনের এরিয়া আপনি নিজে গিয়ে রেকি করে আসুন। আমার সাথে আমার অর্ডার গ্রুপ (মেশিনগান কমাণ্ডের) তিন সেকশনের কমাণ্ডার এবং অন্যান্য অটোমেটিক হাতিয়ার কমাণ্ডার ছিলেন। ২০০ গজ হাঁটার পর শত্রুর পোঁতা মাইন আমার পায়ের নিচে পড়ে এবং পায়ে আঘাত হানে। ঘটনাটা ঘটে নভেম্বরের ৪ তারিখ বেলা ৪টায়, ১৪ রমজানের ইফ্তারের কিছু আগে। বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে আমাদের অধিনায়ক এবং অন্যান্য অফিসার জে.সি.ও, এন.সি.ও ছুটে এসে দেখেন আমি আহত হয়ে পড়ে আছি।

রক্ত পড়ছিলো অনর্গল। আমার কাছে একটি লুঙ্গি এবং হাবিলদারের কাছে একটা লুঙ্গি ছিলো। দুটো লুঙ্গি দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে রাখায় রক্ত পড়া থেমে যায়। পরে ব্যাণ্ডেজ করে নায়েক সুবেদার আব্দুল মোমেন ও ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দিয়ে আমাকে রিয়ার হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। তারা পাশের বাড়ি থেকে ঘরের বেড়া আর ঝাঁপ ইত্যাদি এনে তাতে আমাকে শুইয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন। হেড কোয়ার্টার থেকে আমার দুর্ঘটনা স্থলের দূরত্ব ছিলো ৫/৭ মাইল। আমি যেখানে আহত হই, পাকিস্তানিরা সেখান থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে ছিলো। তারা ইচ্ছা করলে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু যখন আমরা নদী পার হচ্ছিলাম, তখন তারা ফায়ার করেছিলো। তবে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

নভেম্বরের ৫ তারিখে ভারতীয় ৩,২ ফিল্ড মেডিকেল ব্যাটালিয়নে (শালবন–

আগরতলা) অপারেশন করে আমার পা ও হাঁটুর নিচে পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়। ৫/৭ দিন পর আমার জ্ঞান ফিরলে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল ধর্মনগরে (ছনের ঘর) পাঠানো হয়। এখানে ২/৩ দিন ছিলাম। তারপর হেলিকপ্টার যোগে শিলচর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ৪/৫ দিন পর শিলচর থেকে ট্রেনযোগে গোহাটি মিলিটারি হাসপাতালে। এখান ১ মাসের মতো ছিলাম। ডিসেম্বর ৩১ তারিখে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আরো ৩ জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমাকে পুনার খিড়কি সামরিক পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়। খিড়কিতে ১০ আগস্ট (৭২) পর্যন্ত থাকতে হয়েছে। ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে Skin grafting করা হয়। খিড়কিতে আর পুনাতে মে মাসে অপারেশন হয়। পুনাতে limb সংযোজন করা হয়। এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই ভালো। ভারতীয় কর্নেল আব্দুল মজিদ খিড়কি হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলেন। তাঁর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা (যারা খিড়কিতে ছিলেন) বোম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে গিয়েছিলেন।

পুনা ও খিড়কিতে অনেক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ২ জন অফিসারও ছিলেন। একজন (মরহুম) কর্নেল তাহের, ১৪ জন জে.সি.ও, ২ জন বিডিআর এবং সেনাবাহিনীর ২ জন সদস্য। অন্যান্য র‍্যাংকেরও অনেকে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে আমার স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে নভেম্বর মাসে আহত হওয়া আর উল্লেখ্যযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মনগর আক্রমণ। তখন বর্ষাকাল। মে অথবা জুন মাস। আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার ছিলেন মেজর মঈন। আমি ছিলাম ডেলটা কোম্পানি বা কাটআপ পার্টিতে। রাইট ফরোয়ার্ড কাতলামারা এরিয়াতে ছিলো। প্রোটেকশন পার্টির ফোর্স ছিলো বি. কোম্পানি। ঐ কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মেজর মতিউর রহমান। তার সাথে ছিলেন মেজর ভূঁইয়া। এই অপারেশনে আমাদের এ্যাটাকিং ফোর্স ফেল করেছিলো। কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো আর পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড ফায়ার করছিলো—যা বলার মতো না। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা আমাদের ডি. কোম্পানি ঘেরাও করে ফেলে। ডি. কোম্পানির একটা প্লাটুন, যার কমাণ্ডার ছিলেন শহীদ সুবেদার মোমিন, অনারারি লেফটেনান্ট ওয়াজেদ আলী বাকি ওদেরকেও ঘেরাও করে ফেলেছিলো পাকবাহিনী। আল্লাহ্‌র রহমতে আমার মর্টারের ফায়ারের সাহায্যে তারা বেঁচে আসেন। এদের মধ্যে লেঃ কর্নেল সৈয়দ আহমদও ছিলেন। সেদিন প্রায় আমি ৫ শ'র মতো তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা ফেলি। আমাদের চারজন লোক আহত হয়। এদের মধ্যে লেঃ জহিরুল হক আমার পোস্টে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানান।

মোট কথা কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ইণ্ডিয়ার ১৮ রাজপুত বাহিনী আমাদের সঙ্গে ছিলো। তাদের ২/৩ জন লোক মারা যান ও আহত হন।

লেঃ কঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার অবসরপ্রাপ্ত

আমি মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। তবে সচেতন নাগরিক হিসেবে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ছিলাম। ষাট দশকের প্রথম থেকেই আমি দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতাম, পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম। লোকজনের মনোভাব দেখেলেই বোঝা যেতো যে, এরা মার্শাল ল'কে মনে-প্রাণে মেনে নেয়নি। ৬৯-এ যখন দ্বিতীয়বারের মতো মার্শাল ল' জারি করা হলো তখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, দেশ বিভক্ত হবে। কারণ লোকজনের চাল-চলন, মনোভাব সবই পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিলো। তবে যুদ্ধ করে যে দেশে স্বাধীন করতে হবে, এ ধরনের চিন্তা তখনো মনে আসেনি।

২৫ মার্চ আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সিগনাল অফিসার ছিলাম। সেদিন পাকিস্তান আর্মির ২৪ এফ.এফ রেজিমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হয়। এই সংবাদ আমি কুমিল্লা এক্সচেঞ্জের মিঃ আবদুস শুকুরের, যিনি এক্সচেঞ্জ সুপারভাইজার ছিলেন, মারফত নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলাম। যার ফলে ফেনীতে একটা কাঠের পুল জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং মেজর রফিক, যিনি চট্টগ্রামে ইপিআর হেড কোয়ার্টারে এ্যাডজুটেন্ট ছিলেন, এমবুশ স্থাপন করে ২৪ এফ.এফ-এর ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শাহপুর ও তার সৈন্যদের নিহত করেছিলেন।

২৫ মার্চ রাত ১২টার সময় বিগ্রেড মেজর সুলতান আমাকে জানান যে, বাঙালিরা বিদ্রোহ করেছে। You are security risk । আমাকে তাই বন্দী করে সেলে রাখা হয়। ২৫ মার্চ সকালে আমাকে আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ও ৪ জন গার্ড চার কোণে মোতায়েন রাখা হয়। এ ছাড়াও কেটে ফেলে তারা বাড়ির টেলিফোন লাইন। কোনো রকম Source of information ছিলো না। রেডিওতে ভয়েজ অফ আমেরিকা আর বিবিসি শুনতাম।

২৬ মার্চের দিন ও রাত পর্যন্ত নিজের বাড়িকে বন্দী অবস্থায় থাকি। ২৭ মার্চ সূর্য ডোবার পর আমি এখান থেকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিই। আমি বুঝতে পারছিলাম, বন্দী অবস্থায় আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। স্ত্রীকে বললাম, বাড়ির সামনে হৈ-হল্লা করতে, মানে কান্নাকাটি করে সেন্ট্রিদের এ্যাটেনশন তার দিকে নিয়ে যেতে। বাড়ির পেছনে ছিলো ধানক্ষেত। পাকের ঘরের জানালার ফ্লাইপ্রুপ নেট কেটে নিচে নেমে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে প্রায় ১০০ গজ হামাগুড়ি মেরে চলে যাই। তারপর অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়ে আমি হাঁটতে শুরু করি। এই এলাকাটা ক্যান্টনমেন্টের মেইন রোডের কাছাকাছি ছিলো। তারপরই সিভিল এরিয়া। একজন সিভিল আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তাকে পরিচয় দিলাম। সে কিছু না বলে চলে গেলো। তারপর উত্তর-পুব দিকে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তায় কাদা আর পানি ছিলো। পুব আলেকারচর বাজারের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেটা ধরে গোমতি নদীর পারে গেলাম। নদীতে পানি কম ছিলো। নদী পার হয়ে দেখলাম যে, লোকজন কুমিল্লা শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আওয়ামী লীগের একজনকে পেলাম। তাঁর সাথে বুড়িচং পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বাড়িতে রাত কাটালাম। তাঁর নাম এখন আর মনে নেই। যেহেতু আমি আমার পরিচয় দিইনি ওরা আমাকে সন্দেহ করে বুড়িচং থানায় নিয়ে এলো। থানার ওসিকে আমার 'আইডেনটি' টি দিলাম। সে কারণে ওখানে অনেক লোকজনের ভিড়। আমি আর্মির লোক। জানতে চায়, ওরা এখন কি করবে? দিক নির্দেশনা চায়। কিন্তু আমার হাতে এখন কোনো ট্রুপ্স্ নেই।

২৮ মার্চ বুড়িচং থানায় যখন বসে আছি তখন আমার সাথে মিলিত হলেন তখনকার ক্যাপ্টেন হায়দার, যিনি পরে ১৯৭৫ সালে তথাকথিত বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে খালেদ মোশাররফের সাথে শহীদ হয়েছেন। তাঁর batmanও তাঁর সাথে ছিলো। হায়দার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নে ছিলেন। আগে হায়দারের সাথে আমার পরিচয় ছিলো না। বুড়িচং-এ প্রথম পরিচয় হয়। আমি বললাম, ফোর্থ বেঙ্গলতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আছে, কিছু করা যায় কি না ! ক্যাপ্টেন হায়দার যুক্তি দিলেন যে, উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে গিয়ে একটা কোম্পানি নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট রেইড করে অস্ত্র উদ্ধার করবেন। আমি মেনে নিলাম। ২৮ মার্চ রাতে আমি চলে গেলাম কংসনগর বাজারে। ওখানে একজন আওয়ামী লীগ নেতার বাসায় রাত কাটালাম। হায়দারের কোনো খোঁজখবর না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চতুর্থ ইষ্টবেঙ্গলের কমাণ্ডিং অফিসার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড ও কোয়ার্টার মাস্টার ছিলো পাঞ্জাবি। তাদের ডিসআর্ম করে জেলে রাখা হয়েছিলো। মেজর খালেদ মোশাররফ এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে শমসেরনগর চলে গিয়েছিলেন। কাজেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করার জন্য ডিসিশন দেবার মত কোনো অফিসার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তখন ছিলো না।

২৯ মার্চ বিকেল বেলা আমরা বসে আছি। এমন সময় মিঃ আঃ মান্নান, যিনি সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার হাউজের কর্মকর্তা ছিলেন, আরও একজন লোকসহ এসে আমাদের বললেন, ইণ্ডিয়া থেকে আর্মি অফিসার চাচ্ছে। তখন আমি কাল বিলম্ব না করে ওদের সাথে রওয়ানা দিলাম। ক্যাপ্টেন হায়দার ঐ ব্যাটালিয়নের সাথে এক হয়ে যান।

মিঃ মান্নান ও তার সঙ্গীর বাড়ি ছিলো কসবাতে। ওঁরা কসবার এম.পি সিরাজুল হকের নির্দেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে আমাদের খবর দেন।

তারা সবাই আমার সাথে ইণ্ডিয়া গিয়েছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দক্ষিণ দিকে আসতে লাগলাম। উজনিসার ব্রিজের উত্তর পাড়ে আসার পর দেখলাম যে, পুলের দক্ষিণপাড়ে পাক আর্মির (সম্ভবত) ৩১ নম্বর মর্টার ব্যাটারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এ্যাডভান্স করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পুলের দক্ষিণ পাড়ে জনগণ রাস্তা কেটে প্রতিরোধ তৈরি করেছিলো বলে ওরা আসতে পারছিলো না। আমরা খবরটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দিই এবং ব্রিজ বাইপাস করার জন্য পশ্চিম দিকের মাঠে নেমে যাই। এই ঘটনাটা এখনও মনে পড়ে।

তারপর ২৯ তারিখে একটা গ্রামে রাত কাটাই। ৩০ তারিখ সকাল বেলা কসবার দিকে রওয়ানা হই। কসবায় মমতাজ বেগমের (তখন সংসদ সদস্যা) বাড়িতে কিছু খাই এবং ওখান থেকে সিরাজুল হক সাহেবের একটা ভক্সওয়াগনে বিওপিতে যাই। ওখানে ছিলেন বিএসএফ-এর ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। পূর্ব বাংলায় বাড়ি ছিলো। আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আগরতলায় নিয়ে যান। আগরতলায় সন্ধ্যার সময় আমি ৯১ নম্বর BSF কমাণ্ডার কর্নেল ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কমলাসাগর বিওপিতে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর সাথে সেদিন বিশেষ কোনো কথা হয়নি। আমরা সবাই খুব ক্লান্ত ছিলাম বলে। ৯১ নম্বর BSF কর্নেল ব্যানার্জির সাথে পূর্ব পাস্তািনের পরিস্থিতি নিয়ে আমার আলাপ হয় পরে। ওঁরা এ পর্যন্ত রেডিও, পত্র-পত্রিকা আর কিছু শরণার্থীর কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের খবর জেনেছিলেন মাত্র, এর বেশিকিছু নয়। আলাপের শেষদিকে কর্নেল ব্যানার্জি ঠাট্টা করে সেদিন বলেছিলেন, দাদা এবার ইলিশ মাছ খেতে পারবো।

৩১ তারিখ মার্চ সকালের দিকে মান্নানসহ আমি থ্রি নট থ্রি অ্যামুনিশন ও গ্রেনেড নিয়ে কসবা আসি। কসবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের একজন সৈনিককে পাই। তাকে ও মান্নানকে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজ এরিয়াতে আর্মস ও অ্যামুনিশনগুলো দিয়ে পাঠিয়ে দিই এগুলো 'আর্মস ইউজ' করার জন্য। লোকটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে ছিলো, তাই এর ব্যবহার সম্পর্কে ও জানতো। তাঁকে পাঠানো হলো ঐসব অস্ত্রের ট্রেনিংও দিতে। তারপর আমি আগরতলায় চলে গেলাম। ১ এপ্রিল আগরতলা থেকে রামগড় গেলাম চট্টগ্রামের অবস্থার খোঁজ নিতে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম,

মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিককে। রফিকের সিওকে (পাঞ্জাবি) এ্যারেস্ট করে ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো। জিয়া-রফিক কাউকেই আগ থেকে চিনতাম না। এপ্রিলের ১ সপ্তাহে আরও দক্ষিণে সীতাকুণ্ডে গেলাম ট্রুপস্‌দের অবস্থা দেখার জন্য। সীতাকুণ্ড পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের ট্রুপস্‌-এর লাস্ট পজিশন ছিলো।

রামগড় থেকে আবার আগরতলা হয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করি। বাংলাদেশে ঢুকে কসবায় মমতাজ বেগমের বাড়িতে তখনকার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানী, পরে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে বড় খারাপ অবস্থায় দেখতে পেলাম (শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যপ্ত)। সময়টা সম্ভবত এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ ছিলো। তিনি ছদ্মবেশে ছিলেন।

কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো আগে থেকে—রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকতেই। He talked only about himself. মোচ কামিয়ে বোরখা পরে ঢাকা থেকে কীভাবে পালিয়েছিলেন, বলেছিলেন সে কথাও। বারবার আফসোস করছিলেন এই বলে, I Could not Take monti/my dog in the hospital. ইত্যাদি। অবশ্য তাঁর কথার তেমন গুরুত্ব দিইনি সেদিন। এগুলো নগণ্য ব্যাপার ছিলো আমাদের কাছে। ওই সময়ই আমি ওসমানী সাহেবকে ভারতে যাবার প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হতে চাননি। ভারতীয়রা তাঁকে বন্দী করতে পারে, এই রকম ভয়ের কথা বলেছিলেন তিনি। কারণ তিনি ১৯৬৫ সালে ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যা' হোক, তাঁকে অনেক বোঝালাম, আপনিতো ghq-এ বসে যুদ্ধ করেছেন, আমিতো ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছি ৬৫-তে। কিন্তু কই আমাকেতো ওরা কিছু বলেনি। সিচুয়েশন এখনতো অন্যরকম। এখন আপনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। শেষে কর্নেল ওসমানী শর্ত দিলেন যে, তিনি যেতে পারেন ভারতে, তবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে একজন MNA হিসেবে।

আমরা দু'জন পাঁয়ে হেঁটে বর্ডার ক্রস করলাম। সাথে অন্য কেউ ছিলো না। যাবার পথে তাঁকে সবকিছু খুলে বলি। যখন বললাম LT. col. Reza has crossed the border, সেটা শুনেই উনি বলে বসলেন, তাকে কিছু দেয়া যাবে না। আমি বললাম, Why not ? তাঁকে তো অন্তত ট্রেনিং-এর দায়িত্ব দেয়া যায়।

জিয়াউর রহমানের কথা বললাম। কর্নেল ওসমানী জিগ্যেস করলেন Which Zia is that, দালাইলামা ? বললাম, কোনো দালাইলামা-টালাইলামা চিনি না।

পরে জেনেছি মেজর জিয়া, যিনি পরবর্তীকালে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ও আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন, তার নাকের গড়নের জন্য ওসমানী তাঁকে দালাইলামা বলে ডাকতেন।

আগরতলায় ৯১ নম্বর B.S.F হেড কোয়ার্টারে ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের সাথে কর্নেল

ওসমানীর পরিচয় করিয়ে দিই একজন বেসামরিক লোক হিসেবে, কারণ তিনি আমাকে তেমনটাই করতে বলেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে ইন্টেলিজেন্স অফিসার। দিল্লি থেকে এসেছিলেন আগরতলায়। They had a discussion for a long time. অনেক কথাবার্তার পর ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে বললেন, Are not you that Osmani, who did course with me in 1942 ? Then Osmani became sure of his position and status. যাক যখন কর্নেল ওসমানী দেখলেন তাঁর অবস্থা নিরাপদ, তখুনি তিনি আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন, যার দরুন তাঁর সাথে আমার মনোমালিন্য দেখা দিলো।

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে অসুবিধা ছিলো এই যে, আওয়ামী লীগের কেউই আর্মির সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ওসমানী যা বলতেন, ভাবতেন তাই ঠিক। এই Osmani was not only the adviser, he uesd to control the army. And he had strong likings and dislikings. যে জন্য মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে এসে ওসমানী সাহেব আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। যাক, দেশের জন্য ত্যাগ করতে গেলে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার আগে মেজর ছিলাম এবং ১৯৭৫ সালে পর্যন্ত মেজরই রয়ে গেলাম অথচ মেজর শফিউল্লা ও মেজর জিয়া জেনারেল হয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপে আমি লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হই '৭৫ সালের এপ্রিলে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের খড়্গ হস্তের শিকার হলাম আরেকবার। কারণ যুদ্ধের সময় জিয়া ও শওকত উভয়েই চট্টগ্রামে থাকতে চাইতেন, যেহেতু তাঁদের ট্রুপ্‌স্‌ চট্টগ্রামে ছিলো। কিন্তু ওসমানী একজনকেও চট্টগ্রামে রাখেননি। দু'জনকেই সরিয়ে মেজর রফিককে কেবল (He was the Hero of chittagong) ওখানে রাখেন। তারপর শওকত কোলকাতায় গিয়ে ওসমানীর রাগ ভাঙাতে সক্ষম হন।

৭১-এর আগস্টের পর জিয়ার হাতে কোনো কাজ ছিলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর জিয়ারই চিফ অব স্টাফ হবার কথা, কারণ জিয়া সফিউল্লার কোর্সমেট হলেও সিনিয়র ছিলেন। জিয়া খুব depressed থাকতেন। এসব ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই জিয়াকে খোঁচা দিয়ে কথা বলতাম। হয়তো সে-জন্যই '৭৫-এর ১৬ জানুয়ারি আমাকে রিটায়ার্ড করা হয়। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছি।

আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনেক কথা এসে যাবে, যা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। যেমন মাঝারি গোছের একজন সেক্টর কমাণ্ডারকে সেক্টর হোটেলে গিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। শেষদিকে আরেক সেক্টর কমাণ্ডারকে কাজ ফেলে পানীয় নিয়েও পড়ে থাকতে দেখেছি। এক কথায়, যেহেতু আমি সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলাম, সেহেতু আমি বন্দী অবস্থা থেকে পালাতে পেরেছিলাম। কর্নেল ওসমানী যাবার পর আরও কিছু নেতা, যেমন

প্রফেসর রেহমান সোবহান, সিরাজুল হক ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন আগরতলায় চলে এলেন এবং একটা নিউক্লিয়াস গড়ে উঠলো। কুষ্টিয়াতে গভর্নমেন্ট ফর্মআপ হবার আগেই এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আগরতলার শালবনে ৯১ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়নের ছত্রচ্ছায়ায় আমরা একটা হেড কোয়ার্টার বা সাপোর্টিং বা রিয়ার হেড কোয়ার্টার তৈরি করে ফেললাম। হেড কোয়ার্টারের ইন-চার্জ বানানো হলো কর্নেল রবকে, তাঁর সাথে ছিলেন মেজর আবুল ফাত্তাহ, উনি আগে মেডিকেল ইউনিটের administrative officer ছিলেন। ৯১ নম্বর B.S.F আমাদের সব Fascility দেয়। রাজনীতিকরা দিল্লি গিয়ে ভারত সরকারের সাথে বোঝাপড়া করে সাহায্যের আশ্বাস পেলেন। এরপর আমি আমার কাজে লেগে গেলাম, অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা ঠিকঠাক এবং বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের ৫টি সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে আগরতলায় মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। এই যোগাযোগের জন্য আমাদের হাতে কোনো বেতার যন্ত্র ছিলো না। আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সির বেতার যন্ত্র ছিলো। সে কারণে একটার সাথে অন্যটার যোগাযোগ সম্ভব ছিলো না। পুলিশ-ইপিআরদের বেতার যন্ত্রেরও একই অবস্থা ছিলো। যাক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার তুরা ও মেঘালয়ে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে জুলাই-এ কলকাতার থিয়েটার রোডে গেলাম। সেখান থেকে ৬, ৭, ৮, ৯ নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

আবুল কাশেম রফিকুল হক, বীর প্রতীক

ভারতের ইন্দর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সমস্ত প্রশিক্ষণদাতাই ছিলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য। ওইসব প্রশিক্ষকের ভেতরে যাঁদের নাম পড়ে, তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন ধীরেন, ক্যাপ্টেন চৌহান (শিখ) ও সুবেদার মেজর সাব্বির। প্রশিক্ষণ শেষে ৪ নম্বর সেক্টরের সদস্য হিসেবে এবং মে মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরে আমি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।

প্রশিক্ষণ চলার সময় মে মাসে আমরা ৩০ জন সিলেটের বড়লেখা চা-বাগানে শত্রু ছাউনিতে অতর্কিতে আঘাত হানি। জুন মাসের প্রথমদিকে মাহবুবুর রব সাদীর নেতৃত্বে ভারতের বদরপুরের অদূরে জালালপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি স্থাপিত হয়। ওই ঘাঁটিতে অর্থাৎ ৪ নম্বর সেক্টরে (ইকো-৪) আমার স্মরণীয় অপারেশনের ভেতরে প্রথম অপারেশন ছিলো সম্ভবত আশরাফ ভাইয়ের (বীর প্রতীক) নেতৃত্বে সিলেট-জকিগঞ্জ রাস্তার ওপরকার পুলে ধ্বংসের ঘটনা। রাত তিনটার দিকে ৩টা ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী মাইন পুঁতে রাখি। কিছুক্ষণের মধ্যে explosive দিয়ে পুলটি উড়িয়ে দেয়া হয়। সে অপারেশনে ১৫/২০ জন ছিলাম। বিস্ফোরক লাগানোর কাজে আমার সাথে ছিলো সামসু, জসীম ও আতাউর। পুলটি ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুরা আমাদের লক্ষ্য করে নিকটবর্তী পাকিস্তানি ছাউনি ও বাঙ্কার থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমরা ওদের গুলির জবাব না দিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ সমাধা করে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ি। এ অপারেশনে একজন মুক্তিযোদ্ধা সামান্য আহত হন। রাস্তায় পুঁতে রাখা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পরদিন সকালে পাকবাহিনীর সামরিক জিপ ধ্বংস হয়। তিনজন দখলদার বাহিনীসহ বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বসারত আলীর মৃত্যু ঘটে। মাইনের আওয়াজ আমরা দূর থেকে শুনেছিলাম। ক্যাপ্টেন মারা যাবার পর তারা পার্শ্ববর্তী

তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পরে এসব তথ্য জানতে পারি। দ্বিতীয় গেরিলা আক্রমণটি আমরা চালাই লাতু রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্ববর্তী পুলের ওপর আনুমানিক রাত ৩-৩০ মিনিটে। জসীম, মর্তুজা, সালাম ও ইলিয়াসসহ ২৫/২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা এই অপারেশনে অংশ নিই।

তৃতীয় অপারেশনটি জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালিগঞ্জ বাজারের ওপর সংঘটিত হয়। সে অপারেশনের কমাণ্ডার ছিলেন আশরাফুল হক (বীর প্রতীক)। জসীম, প্রদীপ, সামসু ও বদিউদ্দিনসহ আরো প্রায় ১৫/২০ জন মুক্তিযোদ্ধা ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বাজারে অবস্থিত শত্রু ক্যাম্প থেকে ১৭টি রাইফেল ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হই। রাজাকারদের ক্যাম্পে মাঝে মাঝে পাক আর্মি আসতো, রাতে থাকতো না। সেদিন পাকিস্তানিরা আসেনি। চতুর্থ অপারেশন চালাই আমরা জকিগঞ্জ রাস্তার ওপর শরীয়তপুর বাজারের পাশে অবস্থিত সেতু এবং বরাক নদীর মাটির বাঁধের ওপর। ২১ জুন এই দু'টি টার্গেটস্থল explosive দিয়ে উড়িয়ে দেয়ায় জকিগঞ্জের সাথে সিলেটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম অপারেশন আমরা করি ২৯ জুন তারিখে। জকিগঞ্জের আটগ্রামে অবস্থিত পাকবাহিনীর তিনটি ঘাঁটিতে সন্ধ্যাবেলা একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। এতে আমরা আটগ্রাম মসজিদের ঘাঁটি থেকে দু'জন পাকসেনাকে ধরে আনতে সক্ষম হই। '৭১-এ আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিলো ২৯ জুন সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত আটগ্রামের পাকবাহিনীর ৩টি ঘাঁটিতে একযোগে আক্রমণের ঘটনা। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে পড়ি। আটগ্রামের বাসস্ট্যাণ্ডে অবস্থিত ঘাঁটিতে আশরাফুল হক (বীর প্রতীক), ডাক বাংলোর ঘাঁটিতে মাহবুবুর রব সাদী এবং মসজিদের ঘাঁটিতে নেতৃত্ব দেন মনির ভাই। আমি ছিলাম মসজিদের ঘাঁটিতে। নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নাতানপুর বিএসএফ-এর তরফ থেকে আমাদের artillery support দেয়া হয়। এর নিচ দিয়ে গিয়ে মসজিদ সংলগ্ন পাকবাহিনীর ঘাঁটির কিছুটা দূরে পজিশন নিয়ে একত্রে ফায়ার আরম্ভ করি এবং এক ঘন্টা ফায়ারিং-এর পর হঠাৎ করে আমরা ১৪/১৫ জন 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে শত্রু বাঙ্কার অভিমুখে ফায়ার করতে করতে ছুটে চলি। এতে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে শত্রুর এলএমজি। একটি বাঙ্কার থেকে দু'জন পাঠান সৈন্যকে জীবন্ত ধরে ফেলি। বাকিরা রাতের আঁধারে পেছন দিকে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, '৭১-এর জুন মাসে ৪ নম্বর সেক্টরে জীবন্ত পাকসেনা ধরে আনি আমরাই প্রথম।

মমতাজগঞ্জে তখন ছিলেন খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া (বীর প্রতীক)। তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম। অস্ত্র ও যোদ্ধা দিয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করতেন। আমিও তাঁকে সেই ধরনের সহযোগিতা করতাম। এ বিষয়ক দুটো চিরকুট, যা

প্রয়াত সাংবাদিক মাহবুবউল আলম রচিত 'বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। ৮ আগস্ট বাহকের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রে খাজা নিজামউদ্দিন আমাকে লিখছেন, "জরুরি কাজের জন্য আতাউর ও সামসুসহ ভালো ৬ জন যোদ্ধা চাই সন্ধ্যায়। আর অটোমেটিক একটা, বাকি সব রাইফেল। সকালে ফেরত যাবে। আগের যন্ত্র যমরঢ় থাকবে। কিছুক্ষণ আগে এক গাড়ি পাকসেনা আটগ্রাম গিয়েছে। এরা আচমকা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আটগ্রামে খবর পাঠাইও। আর আমার এক্সপ্লোসিভ (বিস্ফোরক) চাই।" পরদিন অর্থাৎ ৯ আগস্ট লিখলেন, "রফিক, এইমাত্র খবর পেলাম, রাজপুর স্কুলে ও রামপুরে পাঞ্জাবিরা বাঙ্কার করছে। আমি আমার গ্রুপসহ তোমার গ্রুপ নদীর পার থেকে উভয় গ্রুপ পরপর ফায়ার করবে। গুলি চালাবে।"

বাংলার সেই বীর সন্তান খাজা নিজামউদ্দিন ভুঁইয়া (বীর প্রতীক) পরবর্তীকালে ৪ সেপ্টেম্বর পাকবাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা ধরে সম্মুখ যুদ্ধ চালিয়ে বীরদর্পে শাহাদত বরণ করেন। খাজা ভাইয়ের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাকবাহিনীর কবল থেকে মমতাজগঞ্জের মোকামটিলা, মণিপুর ও উজান মমতাজগঞ্জ মুক্ত হয়েছিলো।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার বাহিনীসহ বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অমলদিতে অগ্রবর্তী শিবির স্থাপনের জন্য হাই কমাণ্ড থেকে আদেশ করা হয়। স্থানটি ভারতের টুকুর গ্রামের নিকটবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। প্রথমে ৫৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অমলদিতে অবস্থিত সাবেক ইপিআর ক্যাম্পে মূল শিবির স্থাপন করি। পরবর্তীকালে পাকবাহিনীর আক্রমণের চাপ বৃদ্ধির ফলে বাহিনীর সংখ্যা ১২২ জন করা হয়। ক্যাম্পের ডিফেন্স এলাকাটি ছিলো প্রায় ১ মাইল জুড়ে। বাঙ্কার ছিলো ১৯টি। ১৫টি এলএমজি, ৫টি স্টেনগান, ৪টি দু'ইঞ্চি মর্টার। বাকি সব রাইফেল ও এসএলআর, অ্যামুনিশন ও বিস্ফোরকসহ এন্টিপারসন মাইন ছিলো ৮০টিরও বেশি।

আমাদের এই ক্যাম্পের সঙ্গে ভারতের ভাঙ্গটুকুর গ্রামের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) হেড কোয়ার্টারের টেলিফোন যোগাযোগ ছিলো 'লণ্ডন আমস্টারডাম' সাঙ্কেতিক নামে। টেলিফোনে নির্দেশ পেলে তারা তাদের ছাউনি থেকে আমাদের artillery fire-এর মাধ্যমে সাপোর্ট দিতো।

আমাদের সাহসিকতার জন্যেই বাঙ্কার ছেড়ে কেউ আত্মরক্ষার ভয়ে আত্মসমর্পণ বা পিছপা হননি। উপরন্তু আমরা বর্বর বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছি। এতে করে ভারতীয় বাহিনীর artillery সাপোর্টও কখনো কখনো নিতে হতো। আমাদের এই আক্রমণে বিভিন্ন দিনে ৫ জন রাজাকার ও ৬ জন খানসেনা খতম হয়। এই রকম অভিযানেই পাকবাহিনীর গুলিতে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা কুমিল্লা জেলার পাঁচ পুকুরিয়ার সিরাজুল ইসলাম শহীদ হন ১২ আগস্ট রাত ১১টায়।

ছয় বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত আমাদের সেক্টরের অবস্থা দেখার জন্য ক্যাপ্টেন রব, সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল সি. আর. দত্ত ও ভারতের সাংবাদিকরা প্রায়ই আসতেন। আমাদের মুক্ত করা এই এলাকা সম্পর্কে ভারতীয় দৈনিক 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় খবর উঠেছিলো। উল্লেখ্য, আমরা সব মুক্তিযোদ্ধাই ছিলাম ঢাকা, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। মাত্র ক'জন ছাড়া। সবারই ইচ্ছে ছিলো নিজ নিজ এলাকা সেক্টরে যুদ্ধ করার। তাই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গাড়িযোগে (কনভয়ে) জেলাসমূহে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ৩ নম্বর সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিলেটে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। তাই আমি ৩ নম্বর সেক্টরে আসার সময় অমলদি অগ্রগামী ক্যাম্পের দায়িত্ব অর্পণ করি তদানীন্তন ইপিআর ও মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানির কাছে।

এখানে, ৩ নম্বর সেক্টরে মেজর এ. মতিন সাহেবের নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি অপারেশনে অংশ নিই।

অবশেষে ৩ ডিসেম্বর আগরতলা বিমানবন্দর বরাবর আখাউড়া সীমান্তে পাকবাহিনীর ঘাঁটির বিপরীতে রাত দশটার সময় মেজর এ. মতিনের নেতৃত্বে আমরা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য ছোট ছোট ম্যানহোল খুঁড়ে অবস্থান নিই এবং কিছুক্ষণ পরই পাকবাহিনীর বাঙ্কার ও ঘাঁটি লক্ষ্য করে সবাই এক সাথে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকি। সারারাত গোলাগুলির পর শেষরাতে মিত্রবাহিনী (ভারতীয়) আমাদের সাথে অংশ নেয়। দু'দিন তুমুল যুদ্ধের পর আখাউড়া পাকবাহিনীর পতন হয়। ৬ ডিসেম্বর আখাউড়া যুদ্ধ শেষ হলে পাকিস্তানিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আশুগঞ্জ এবং সেখান থেকে ভৈরববাজার এসে close হয়। আশুগঞ্জে পাকবাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। ৩ ডিসেম্বর থেকেই বুঝতে পারছিলাম মিত্রবাহিনী আমাদের সঙ্গে যখন যোগ দিয়েছে, তখন সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর সেনাদল ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে দুর্বার বেগে সবদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাক হানাদার বাহিনীর ওপর। যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনী সর্বত্রই পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে থাকে। এইভাবেই যুদ্ধ শেষ হয়। ভেবেছিলাম ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশে কেউ বঞ্চিত হবে না স্বাধীনতার সুফল থেকে। শোণিতের নক্ষত্র জ্বেলে যাঁরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন, অথচ নিজেরা ঘরে ফিরতে পারেননি, সেই শহীদ যোদ্ধারাও আজ বিগত জীবনের অধিকারী। ওদের অনেকেই পাননি জাতীয় বীরের মর্যাদা। আমার গভীর দুঃখটা সেখানেই।

মেজর এম. এ. মুত্তালিব

চার ও পাঁচ নম্বর সেক্টরে লড়েছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম. এ. মুত্তালিব। গ্রামের বাড়ি তাঁর নেত্রকোনার পূর্বধলা থানার কাজলা গ্রামে। একই গ্রামের মানুষ বীরযোদ্ধা কর্নেল আবু তাহের। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা মেজর গনির ব্যক্তিগত আগ্রহেই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সিলেটে ব্যবসা ও রাজনীতি করতেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা মেজর এম. এ. মুত্তালিবের নিজের জবানবন্দীতে নিচে পত্রস্থ করা হলো

২৫ মার্চের সারাদিন এবং মধ্যরাত পর্যন্ত সিলেট শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানালাম। রাতে আমরা বালুরচর বাসায় যখন ভাত খেতে বসেছি, তখুনি ঘরের চালে গুলি এসে পড়ে। ঘর থেকে বের হয়ে সাদীপুর-টিলাগড় চৌরাস্তায় উঠে আসি। সাথে একটা ব্যাগ আর একটা রিভলভার। দ্রুত রাস্তার পাশে আত্মগোপন করি। সেই অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি গাড়ি দেখতে পাই। গাড়িটার গতি শ্লথ হয়ে আসে এক সময় এবং উত্তর দিকে মোড় নিয়ে আবার বেগে এগিয়ে যায়। দ্রুত গুলি ছুঁড়ি আমি। গাড়ি চালকের মাথায় তা বিদ্ধ হয় এবং গাড়িটা উল্টে যায়। আরোহী আহত হয়। দৌড়ে গিয়ে আরো একটি বুলেট ব্যয় করে তাদের একটা চাইনিজ স্টেনগান এবং একটা রাইফেল তুলে নিয়ে ডিগ্রি কলেজ সীমানার দেয়াল টপকে পালাই।

পরে অনেক জায়গা ঘুরে বিভিন্ন ঘটনার যোগে ২৭ মার্চ ভারতের ত্রিপুরায় পৌঁছি।

তখন জুলাই মাস। হরিপুর, শ্রীপুর, হেমু ও ডাউকীসহ ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টর এলাকায় অসংখ্য অপারেশন করেছি আমি। এর মধ্যে জৈন্তা অপারেশন আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

সবে জৈন্তাপুর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমার পরিবার তখন তামাবিল সীমান্ত থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার ভেতরে সকাপুঞ্জিতে। প্রায় ৮ শ' সৈন্য মুক্তাপুরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে আমি বাসাতে যাই।

রাত তিনটা। গুলিবিদ্ধ হয়েছি—এই রকম স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। আমার স্ত্রীকে জাগানোর পর রান্না করে খাওয়া-দাওয়া শেষে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একটা গাছের আড়াল থেকে মেশিনগান চালাচ্ছিলাম। সাথে একজন নেপালী। গাছ ভেদ করে একটা গুলি আমার গলায় ও নেপালীর দুই উরুতে লাগে। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে, এক হাত দিয়ে আমার নিজের ক্ষতস্থান ধরে রেখেছি। সীমান্তের কাছাকাছি এলে ভারতীয় সৈন্যরা এসে সাহায্য করে। আমি এক সময় অজ্ঞান হয়ে যাই। আমাকে পরে শিলং হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ক্যাপ্টেন ডাঃ সিতারা বেগম, বীর প্রতীক (অবঃ)

১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি হলিক্রস কলেজের ছাত্রী। প্রচুর খেলাধুলো করতাম। ডাক্তার হওয়ার পর ৬ মাস 'ইন্টার্নিশিপ' করে আর্মিতে ১৯৭০ সালের জুন–জুলাই মাসে যোগদান করি। কারণ, আমার বড় ভাইও ছিলেন আর্মিতে। ১৯৭০ সালে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত একজন লেফটেনান্ট–এর পদে ছিলাম। ১৯৭১–এ শেষের দিকে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে আমার পদোন্নতি ঘটে—আমি ক্যাপ্টেন হই। বড় ভাই হায়দার সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। ছোট ভাই এ.টি.এম সাফদার (জিতু) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিভিন্ন খবর এবং গোপন–বার্তা পৌঁছে দেবার কাজে নিয়োজিত ছিলো।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে আমি ছিলাম কুমিল্লায়। বড় ভাই মেজর হায়দার পিণ্ডির চেরাট থেকে এই সময় বদলি হয়ে তৃতীয় কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নে চলে আসেন। যদ্দুর মনে পড়ে তারিখটা ছিলো ৫ ফেব্রুয়ারি, রোজার দিন। দু'ভাই–বোন কিশোরগঞ্জে বেড়াতে এসেছি। আমার ছুটি ছিলো ১ মাস আর বড় ভাই হায়দারের ছুটি ছিলো ২ সপ্তাহের। তিনি কুমিল্লায় ফিরে গেলেন একমাস পর ছুটি শেষ হবার আগেই। আর তখুনি শুরু হয়ে গেলো দেশে রাজনৈতিক সংঘাতজনিত আলোড়ন।

মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। বড় ভাই তখন ক্যান্টনমেন্টে। আমার এক ফুপার বাসায় এসে তিনি লুকিয়ে-ছুপিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর কথা মতো, ছুটির পর সেনাবাহিনীতে আবার যোগ দিয়ে কিশোরগঞ্জে বাসায় ফিরে আসি। কিন্তু যেদিন কিশোরগঞ্জ স্টেশনে air-raid হলো, সেদিনই আমরা পালালাম। মামার শ্বশুর বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে ৩ মাইল দূরে ছিলো। চলে গেলাম সেখানেই। এক সপ্তাহ থাকার পর আবার কিশোরগঞ্জে ফিরে এলাম। ক্যাপ্টেন নাসের এবং বড় ভাই হায়দার ময়মনসিংহের দুটো ব্রিজ উড়িয়ে

দিতে এখানে এলেন। এই সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হেড কোয়ার্টার্স থেকে ২/৩টা টেলিগ্রাম এলো 'জয়েন' করার জন্য চাপ দিয়ে। আব্বাই এগুলোর উত্তর দিতেন এই লিখে : She is sick. অর্থাৎ আমি অসুস্থ।

এক সপ্তাহ কিশোরগঞ্জে থাকার পর মিলিটারি আসার মাত্র দু' দিন আগে দশ-বারো মাইল উত্তরে হোসেনপুরে আম্মার নানার বাড়ি পালিয়ে গেলাম। ওখানে থাকার সময় বড় ভাইয়ের খবর পেতাম। লোক মুখে শুনতাম, তিনি আগরতলায় আছেন, ট্রেনিং দিচ্ছেন। বিশ্বাস করতাম না। কিশোরগঞ্জে সেই তখন আমার বড় ভাই ও আব্বার নামে কাগজে বেরুতো যে, তাদেরকে ধরে দিলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। জুলাইয়ের শেষের দিকে বড় ভাই একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্যকে আমাদের কাছে পাঠালেন বাবা-মাকে পাকবাহিনী মেরে ফেলেছে— এই খবর পেয়ে। তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন খবরটার সঠিকতা সম্পর্কে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে একটানা আট-দশদিন নৌকোয় চেপে কিশোরগঞ্জের গোজদিয়া ঘাঁটি হয়ে মেঘালয় পৌঁছুলাম। তারপর সিলেটের টেকেরহাটে ছিলাম এক সপ্তাহ। এরিমধ্যে বড় ভাই কী করে যেনো আমার খবর পেলেন, জানি না। সেখান থেকে ট্রাকে করে পৌঁছুলাম শিলং-এ। পথে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়ায় শিলং-এ থাকলাম ৪/৫ দিন। পরে গৌহাটি হয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছুলাম মেঘালয়ে। দু' তিন সপ্তাহ পরে যোগ দিলাম বাংলাদেশ হাসপাতালে।

আমি ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিলাম। মেঘালয়ের বাংলাদেশ হাসপাতালটি বাঁশের তৈরি ছিলো এবং তাতে বেড ছিলো চারশো'র মতো। মেডিকেল কলেজের তিন-চারজন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। লণ্ডন থেকে মবিন এসেছিলেন, এসেছিলেন ডাঃ জাফরউল্লাহ, ডাঃ কিরণ সরকার দেবনাথ, ডাঃ ফারুক মাহমুদ, ডাঃ নাজিমুদ্দিন এবং ডাঃ মোর্শেদ। এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দম-বারো জন ভলান্টিয়ারও আর্মি থেকে এসেছিলেন। তবে সুবেদারের ওপরে কেউ ছিলেন না। কোনো ভারতীয় ডাক্তার আমাদের সাথে নিয়মিতভাবে থাকতেন না। তবে ওষুধের জন্য আগরতলা ও উদয়পুরে যেতে হতো। উদয়পুরের ডিসি মিঃ ব্যানার্জি, আগরতলা এডুকেশন বোর্ডের পরিচালক ডাঃ চ্যাটার্জি, ডাঃ মজুমদার এবং ডাঃ চক্রবর্তী এঁরা আমাদের প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

আমাদের OT অর্থাৎ Operation Theatre ছিলো প্লাস্টিক ক্লথ দিয়ে চারদিকে ঘের দেয়া একটা ঘর। এর মেঝেও আবৃত ছিলো প্লাস্টিক ক্লথে। আমি ওখানে থাকবার সময় কেবল দু' জন রোগী ডায়রিয়া-ডিসেন্ট্রিতে মারা গিয়েছিলো।

ইণ্ডিয়ান আর্মিরও অনেক সৈন্য আসতো এখানে চিকিৎসার জন্য। আমি আগরতলা IA HOSPITAL-এ মাঝে-মধ্যে যেতাম।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকেও আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকতো ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

একবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা ট্রাক রাস্তার খাদে উল্টে পড়ে গিয়েছিলো। ট্রাকটি সেনা সদস্যে ছিলো ঠাঁসা। আহতদেরকে আমাদের এ্যাম্বুলেন্সে করে এনে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। জেনারেল রব-এর হেলিকপ্টারে গুলি লেগেছিলো। তিনিও এখানে চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন।

যখন হাসপাতালে ছিলাম, তখনও বড় ভাই হায়দারের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম না। অধিকাংশ সময় অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন তিনি। মাঝেসাঝে দেখা হতো। আব্বা-আম্মা মেলাঘর ক্যাম্পের কাছেই একটা মাটির ঘর ভাড়া নিয়ে মেঝেতে প্লাস্টিক ব্যাগ বিছিয়ে দিন-রাত যাপন করতেন। তাঁদের সাথেও ভাইয়া দেখা করবার সময় পেতেন না।

১৬ ডিসেম্বরের রাতে আমি মেলাঘরের হাসপাতালে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমাদের একটা রেডিও সেট ছিলো। এই সময় হঠাৎ একটি ছেলে চিৎকার করে ওঠে, ঢাকা মুক্ত হয়ে গেছে বলে আর সঙ্গে সঙ্গে আর সকলের আকাশ কাঁপানো শ্লোগানের পর শ্লোগানে মুহূর্তে পাল্টে যায় পরিবেশ। আমাদের মধ্যে তখন কেউ কেউ কাঁদছিলো, কেউ হাসছিলো, কেউ-বা খুশিতে লাফাচ্ছিলো। সবই দেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার খবরে। আমাদের হাসপাতালের রোগীরা পর্যন্ত জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় কমলা লেবু বিতরণের অনুষ্ঠান, নিজেদের মধ্যে।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমি কলকাতায় বদলি হলাম। এর তিন থেকে চার সপ্তাহ পর ঢাকায় চলে আসি। স্পষ্ট মনে আছে সেদিনকার কথা। সেদিন যখন প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করছিলাম চোখ দিয়ে অঝোরে ঝরছিলো পানি। সেই তখন আব্বাকে কলকাতায় থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিলো; কিন্তু তিনি রাজি হননি।

ঢাকার ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে ছিলো বড় ভাই হায়দারের অফিস। ঢাকায় এসে দেখা করলাম তাঁর সাথে। ২/৩ দিন ঢাকায় ছিলাম। তারপর আবার মেলাঘর হাসপাতালে ফিরে গেলাম। হাসপাতাল গুটিয়ে আসতে আসতে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৭২-এর অক্টোবর মাসে লেফটেনান্ট আবেদুর রহমানের সাথে আমার বিয়ে হয়। তিনিও একজন ডাক্তার এবং মুক্তিযোদ্ধা।

মোহাম্মদ সামসুদ্দিন, বীর প্রতীক

আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক ও গ্রাম পর্যায়ের কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। রাজনীতি সম্বন্ধে তেমন কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সাড়া না দিয়ে হাত গুটিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকার মত কাপুরুষও আমি হতে পারিনি। তাই স্বাধীনতাকামী জনতার সারিতে মিশে যাই এবং সংগ্রামী জননেতাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।

দিন-তারিখ মনে নেই। সম্ভবত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকেই হবে। ভায়ের বাসার জন্য বাজার করে যখন ফিরছিলাম, ঠিক তখুনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাক হানাদার বাহিনীর ৩টি জেট বিমান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অপিস ভবন লক্ষ্য করে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ শুরু করে। আমার সবচাইতে নিকটবর্তী স্থান ছিলো তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্ট। দূরত্ব আনুমানিক ৫০০ গজ। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আত্মরক্ষার জন্য পৌরসভার তৈরি ড্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়ি। ১৫/২০ মিনিটকাল বোমাবর্ষণের পর পাক বর্বরদের বিমানগুলো চলে যায়। মনে হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এখন কিছুটা শান্ত, আর কোনো চিন্তা নেই, তখন আমি বাসার দিকে যাত্রা করি। অল্প কিছুটা পথ ছাড়াবার পর দেখতে পাই, রাস্তার পাশে একটি হিন্দু বাড়ির ঘরের দরজা ও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ ক'জন লোক কান পেতে কী যেনো শুনছে। আমিও শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝলাম, সমবেত লোকগুলো রেডিও শুনছে, আমিও শুনলাম সেই বেতার ঘোষণা : আমি মেজর জিয়া বলছি। আর যা ঘোষণা করা হলো, তার সবকিছু বুঝে উঠবার মতো মন-মানসিকতা তখন আমার ছিলো না। ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর সংগ্রামী ছাত্র-জনতা এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দখলেই ছিলো। যার অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার)।

তারপর হঠাৎ করেই একদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পাকসেনাদের দখলে চলে

যায়। আমরা তখন পাক বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য ২২ এপ্রিল সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া সীমান্তের বিপরীতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ত্রিপুরা রাজ্যের সিমলায় মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে চলে আসি। সেই ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম। আমি লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম সাহেবের অধীনে প্রাথমিক ট্রেনিং নিই। মাত্র ৭ দিন। এই ৭ দিনের একদিন লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, আমরা এখানে কেন এসেছি ? কথাটা আজ আমার কাছে খুব সহজ; কিন্তু এর উত্তরটা সেদিন ভীষণ কঠিন মনে হয়েছিলো। উত্তর হতো, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা ভারতে এসেছি। যতোটুকু মনে পড়ে, আমার চেয়ে উচ্চশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারাও এতো সহজভাবে এ প্রশ্নটার উত্তর সেদিন দিতে পারেননি। কারণ ইব্রাহিম সাহেব এ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছিলো, সুন্দরবন থেকে একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার গুলিবিদ্ধ হয়ে আমাদের ভেতরে এসে এইমাত্র হাজির হয়েছে।

এমনিভাবে ৭ দিন গত হলো। ৮ দিনের দিন হঠাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৮টি ট্রাক ও একটি জিপ এসে হাজির। জিপে বসা একজন ক্যাপ্টেন, জাতিতে শিখ। অবশেষে এ-গাড়িতে করেই আমাদের উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। ৪৮টি ট্রাকের মধ্যে ৪৮ জন করে মুক্তযোদ্ধা আর এদের মধ্যে একজন করে কামাণ্ডার। আমি ৩ নম্বর ট্রাকের কমাণ্ডারের দায়িত্ব পেলাম। তার পরদিন ক্যাপ্টেন সাহেবের জিপ সামনে রেখে সমস্ত ট্রাক বহর চলতে লাগলো। এই যাত্রার সময় কেনো জানি মনে হতে লাগলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে আমি যেনো বার্মা রাণাঙ্গনের দিকে চলেছি। এভাবে তিন দিন, তিন রাত গাড়ি চলার পর 'হায়ার ট্রেনিং' সেন্টার আসামের কাছাড় জেলার ইন্দরনগরে এসে পৌছুলাম। তখন সূর্য ওঠেনি। অন্ধকার। তার ভেতরেই শুনলাম অসংখ্য বানরের কিচিরমিচির ডাক।

সূর্য যখন উঠলো, তখন তাকিয়ে দেখি চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সেই সাথে গাড়ির অরণ্য। সেইসব গাড়ির সামনে ছোটো ছোটো কয়েকটি তাঁবু, তার ভেতরে ২ থেকে ৬ জন করে ভারতীয় সেনা-সদস্য। চারদিককার অবস্থা দেখে মনে হলো, আমরাই প্রথম এই ইন্দরনগরে ট্রেনিং নিতে এসেছি। যখন আমি গাড়ি থেকে নামলাম, দেখলাম, আমার ধারণা সত্যি। নাম, পিতার নাম, গ্রাম, থানা এই সব লিখেটিখে নেবার পর আমি আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় হাজার গজ ওপরে উঠলাম। সেখানে তাঁবু এবং উপজাতীয়দের কিছু কুঁড়েঘর। একটা বড় মতো তাঁবু বেছে নিয়ে সেটা সবাই মিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার করে ফেললাম। তারপর গাছের পাতা-টাতা ফেলে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিলো বলে আমরা সবাই অসম্ভব ক্লান্ত ছিলাম। আমাদের এই রকম ক্লান্ত অবস্থা দেখে ইন্দরনগর ট্রেনিং সেন্টার কমাণ্ডার অধিনায়ক

কর্নেল বাগচী (ভারতীয়) আমাদের সবাইকে ৩ দিন টানা বিশ্রাম নেবার অনুমতি দিলেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন কর্নেল বাগচী আমাদের উদ্দেশে বললেন, "আমার বাড়িও একদিন তোমাদের দেশেই ছিলো। ফরিদপুরে শেখ মুজিব ছিলো আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত আর গর্বিত। কারণ যে বাংলা একদিন আমার মাতৃভূমি ছিলো, সে বাংলারই ছেলেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আজ আমার ওপর।"

আমাদের দলনেতা ছিলেন মাহবুবুর রব সাদী। আমি যখন সাদী ভাইকে দেখতাম, তখন মনে মনে ভাবতাম, তাঁর মতো ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি দেশপ্রেমিক। তিনি ছাড়াও মনির, শহীদ নিজামউদ্দিন ভুঁইয়া (বীর উত্তম), আশরাফ, আশরাফুল হক (বীর প্রতীক), যুদ্ধাহত মুক্তযোদ্ধা জসীম ও এ. কে. এম. রফিকুল হক (বীর প্রতীক) ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

শুরু হলো নাম জানা-অজানা শত সহস্র বাংলা মায়ের দামাল ছেলের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ। মাত্র এক মাস তেরো দিনের প্রশিক্ষণেই আমরা মোটামুটি সবকিছু আয়ত্ত করে ফেললাম। কেমন করে হাই এক্সপ্লোসিভ, ৩৫ হ্যাণ্ড গ্রেনেড, স্টেনগান, রাইফেল, এসএলআর ও এসএমজি ইত্যাদি ছুঁড়তে ও চালাতে হয়, সবই শিখে ফেললাম।

মুক্তিযুদ্ধে আমার উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো আখাউড়া সীমান্তে। ১ ডিসেম্বর রাত দশটায় মেজর মতিন-এর নেতৃত্বে আগরতলা বিমানবন্দর থেকে পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে বিপরীত দিকের অবস্থানে চুপিসারে এসে ম্যানহোল খুঁড়ে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য পজিশন নিই এবং একত্রে ফায়ার আরম্ভ করি। সারারাত গোলাগুলির পর শেষ রাতের দিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন। এখানে উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। ৪ ডিসেম্বর আমি যখন বাঙ্কারে পজিশনরত অবস্থায় শত্রুপক্ষের দিকে তাক করে এলএমজি ফায়ার করছিলাম, ঠিক সেই সময় শত্রুপক্ষের একটি মর্টারের গোলা আমার বাঙ্কারের ওপর পড়ে এবং বাঙ্কার ধসে পড়ে আমার ওপর। সহযোদ্ধারা অনেক চেষ্টা করে টেনেহিঁচড়ে আমাকে বের করে আনেন। মেরুদণ্ডে ভীষণ আঘাত পাই। চিকিৎসার জন্য ১৯৭৮ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে হাঙ্গেরিতে পাঠান; কিন্তু ওখানকার মেডিকেল বোর্ড জানালেন, সময় শেষ, এখন আর চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হবে না। তাই ২৮ দিন পর বাংলাদেশে ফেরত পাঠান। আর তখন থেকেই আরম্ভ হয় আমার এই হুইল চেয়ারের অভিশপ্ত জীবন।

আব্দুস সালাম বাচ্চু

কেমন ছিলেন ত্রিপুরায় ? কেমন কেটেছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো ? বলতেই পুরনো স্মৃতি ভেসে ওঠে পঞ্চাশের কোঠায় পা দেয়া মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার আব্দুস সালাম বাচ্চুর মনে। তিনি ছিলেন গোকুলনগর ইয়ুথ ক্যাম্পের স্টোর অফিসার এবং 'পলিটিক্যাল মোটিভেটর'।

তাঁর নিজের ভাষায়, "যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমি আগরতলায় পৌছি। প্রথমে আগরতলা কংগ্রেস ভবনে গিয়ে আমাদের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে গোকুলনগর ইয়ুথ ক্যাম্পের 'স্টোর অফিসার' ও একই সাথে 'পলিটিক্যাল মোটিভেটর' হিসেবে নিয়োগ করেন। কারণ সে সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক অধিকর্তা ছিলেন তিনি নিজে।

"আমার ক্যাম্পটার নাম ছিল 'পদ্মা'। প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধা এখানে প্রতি মাসে ট্রেনিং নিতো। কোনো কোনো সময়ে অনেক ছেলেকে মিলরে এবং দেরাদুনে ট্রেনিং-এর জন্যেও পাঠাতাম। গোকুলনগর ক্যাম্পের সেই সময়কার ক্যাম্প চিফ ছিলেন এম.পি সামসুল হক। ভারতের পক্ষ থেকে ছিলেন ক্যাপ্টেন মান সিং এবং আমাদের বাঙালি আরো কিছু অফিসার। যুদ্ধের সময় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাঁরা আমার ক্যাম্প ঘুরে গেছেন কয়েকবার তাঁদের মধ্যে একজন লেঃ জেঃ অরোরা। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো। আর একজন ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং, মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতরে যাঁর পরিচিতি ছিলো অপরিসীম। আর একজন ভারতীয় অফিসারের কথা মনে পড়ছে। তিনি মাদ্রাজি—নাম লেঃ কঃ সুব্রামানিয়াম। এই মানুষটি আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। লেঃ কঃ সুব্রামানিয়াম ভারতীয় পক্ষ থেকে আরও বেশকিছু ইয়ুথ ক্যাম্পের চার্জে ছিলেন।

"ট্রেনিং ছাড়াও ক্যাম্পের ছেলেদের নিয়ে যাওয়া হতো বিভিন্ন জায়গায়

'অপারেশনের' জন্য। 'পলিটিক্যাল মোটিভেটর' বা রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। একই সাথে স্টোর অফিসারের দায়িত্বও কম নয়। আহারাদি যা কিছু আমার মাধ্যমেই বিতরণ করা হতো। তাই প্রায় প্রতিনিয়তই আমাকে বিশালগড় ও উদয়পুর ইত্যাদি জায়গায় যেতে হতো। যাতায়াতে কখনো বাস, কখনো বা ক্যাম্পের জিপ ব্যবহার করতাম। আমার কাজের অগ্রগতি দেখে জহুর আহমদ চৌধুরী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈদয় নজরুল ইসলাম আমাকে ডেপুটি ক্যাম্প কমাণ্ডার হিসেবে নিয়োগ করেন। দু'বার আমি আগরতলা থেকে কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে অফিসিয়াল কাজে গেছি।

"সম্ভবত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব আমার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় সেপ্টেম্বরে গোকুলনগর ক্যাম্প পরিদর্শন করে বেশকিছু খাদ্যদ্রব্য ও কম্বল দিয়ে যান। ক্যাম্পের জন্য খাদ্য পেতাম আমরা জেনেভা সংস্থা, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে। অনেক সময় আমরা দেশের ভেতরে ঢুকে রাজাকারদের ধরে নিয়ে আসতাম। ওদের কোয়ার্টার গার্ডে ২৮ দিন বদ্ধ রেখে মগজ ধোলাই করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করাতাম। প্রত্যেকটা রাজাকারের মাথা আমরা মুড়িয়ে দিতাম। আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। এককালে আমি মিলিটারিতে ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর ঢাকার বক্সিবাজারে আমি ৩০/৪০ জন ছেলেকে একত্র করে মিলিটারি ট্রেনিং দিয়েছি। আজ সব ইতিহাস।"

গৌতম দাস, সাংবাদিক, আগরতলা

উনিশ শ' একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ষোল ডিসেম্বর—সাড়ে আট মাস, একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং যে স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার অসম সাহসী লড়াই, জীবনদান, আজ দু'দশক পর তা অতীত ইতিহাসের পাতায়। বাংলাদেশের সে সময়কার সাত কোটি মানুষের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে আগরতলাসহ ত্রিপুরার সব অংশের মানুষের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছিলো। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়ের মানুষের মতো ত্রিপুরার অধিবাসীরাও ছিলেন এর সক্রিয় শরিক। গরিব অনগ্রসর ত্রিপুরার মানুষ কী উপজাতি, কী অ-উপজাতি—সকলেই আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের জনগণের প্রতি এবং সে সংহতি ছিলো নিঃস্বার্থ।

কী করে ভুলি একাত্তরের সেই দিনগুলোর কথা, যার প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো একদিকে উত্তেজনা, উদ্বেগ, অপরদিকে আবেগ ও রোমাঞ্চে ভরা। একাত্তরের মার্চ। উত্তাল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পেলো শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগকে সরকার গড়তে দেবে না, জনগণের রায় মানবে না, ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে বেধে গেলো তাদের অনিবার্য সংঘাত। ঢাকা–চট্টগ্রামসহ সর্বত্র উত্তাল বিক্ষোভ। শ্রমিক-কৃষক, কর্মচারি-অফিসার, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবীদের মিছিল রাস্তায় রাস্তায়। আমরা ঢাকা রেডিও, আকাশবাণী, বিবিসি ও ভোয়া'র প্রতিটি বুলেটিনের সংবাদ শুনতে রেডিও'র সামনে কান পেতে বসে, প্রতিটি মুহূর্ত উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনাপূর্ণ, অবশেষে যা অনিবার্য, তাই ঘটে গেলো।

'৭১-এর ২৫ মার্চ। হিংস্র ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে লেলিয়ে দিলেন জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, গ্রেফতার হলেন শেখ মুজিব—শুরু হলো বাংলাদেশের জনগণের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্রথম ধাক্কাতেই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-পুরুষ সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়লেন ত্রিপুরায়।

পরদিন, ২৬ মার্চ প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করে সমগ্র ভারতবাসীকে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়া হলো এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিতে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হলো। ২৯ মার্চ সি.পি.আই (এম) প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানায়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের, সেইসাথে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশবাসীদের অর্থ, ত্রাণসামগ্রী ও চিকিৎসা সাহায্য দিতে সিপিআই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য জ্যোতি বসুকে চেয়ারম্যান করে 'বাংলাদেশ সংহতি এবং সাহায্য কমিটি' গঠন করা হয়।

আমাদের ছিলো শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শগত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আমরা পূর্ণ সমর্থন দিয়েছি। এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে এবং মার্কসবাদী বিশ্বাসী বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার জন্য আমরা সার্বিক প্রয়াস চালিয়েছিলাম।

আমাদের পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৯৫ শতাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে। আমরা এটাও জানতাম বাংলাদেশের বামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড মতাদর্শগত বিতর্ক রয়েছে ; কিন্তু তারাও স্বাধীনতার যুদ্ধে বেরিকেডের মুখোমুখি। আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম বামপন্থী দলগুলোর সাথে সমন্বয় বাড়াতে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো সুংসহত করতে সাহায্য করবে। আমাদের এ প্রচেষ্টাও সফল হয়েছিলো। বামপন্থী বলে পরিচিত অন্য কয়েকটি গোষ্ঠী বাদ দিয়ে অধিকাংশই নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাঁরাই আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভেতর দিয়ে যোগাযোগ রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ, শিবির গড়া, অস্ত্র সংগ্রহ করা, ভেতরে যোগাযোগ গড়ে তোলা, শত্রুর ঘাঁটিতে আঘাত হানা, যাবতীয় বিষয়ে একটা নিবিড় সমঝোতা গড়ে তুলেছিলেন।

ত্রিপুরা একটি আদিবাসী উপজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ি রাজ্য। ভারত ভাগের

ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে স্রোতের মতো বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন, ফলে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে সীমিত ভালো জমি ছেড়ে আরো গভীর জঙ্গলে সরে যেতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সূচনার ফলে বাংলাদেশেল আরো লক্ষ লক্ষ নাগরিক উদ্বাস্তু হয়ে প্রবেশ করেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার উপজাতিরাও চরম অভাব সত্ত্বেও হাসিমুখে তাদের গ্রহণ করেন। গড়ে ওঠে সর্বত্রই শরণার্থী শিবির মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প, যার অধিকাংশই ছিলো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। পাকিস্তানিদের অনেক শেল ও গোলা এসে পড়েছে অসামরিক এলাকায়। অনেক স্থানীয় বাসিন্দা হারিয়েছেন প্রাণ ; কিন্তু কোনো তিক্ততা হয়নি, বরং তারা হাসিমুখে সব ক্লেশ বরণ করে নিয়েছেন, এ বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা সত্যিই তুলনাহীন।

আগরতলা, তখন বলা যায়, বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজধানী। প্রায় সব দলের প্রথম সারির সব নেতা তখন এখানে। ঢাকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশ তখন আগরতলায়। আওয়ামী লীগের অনেক জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ সদস্য যেমন আগতলায় ছিলেন, তেমনি বামপন্থী দলগুলোরও নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্বের অনেকে এখানে অবস্থান করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ও আ.স.ম আবদুর রব প্রমুখ আগরতলায় দক্ষিণ প্রান্তের টাউন প্রতাপগড়ে একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। এম.এন. এ-রা থাকতেন এম.এম.এস হোস্টেলে। সেখানে গাফফার চৌধুরী ও অন্য সাংবাদিকরাও থাকতেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতারা থাকতেন আগরতলার পূর্বাংশে বনমালীপুরের ক্রাফ্ট্ টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে। অন্য বামপন্থী নেতারা, ভাসানী ন্যাপের নেতারা, যেমন শ্রমিক নেতা আবুল বাশার, রাশেদ খান মেনন, কাজি জাফর আহমদ, সিরাজুল হোসেন খান, মার্শাল সিরাজ, হায়দার আকবর খান রনো, তাঁর ভাই জুনো, আবদুল্লাহ আল নোমান, মান্নান ভুঁইয়া, ডাঃ ফরিদুল হুদা প্রমুখ থাকতেন রামনগরের ৬ নম্বর রাস্তায় সিপিআই(এম) নেতা ভানু ঘোষ ও খগেন দাসের বাড়িতে। কাজি জাফর ও মেননের স্ত্রীরাও থাকতেন ঐ বাড়িতে বামপন্থী শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী অনুপমা দাসের তত্ত্বাবধানে। বনমালীপুরে নৃপেন চক্রবর্তীর দাদা ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তীর বাসভবনেও ছিলেন অনেকে। প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক কামাল লোহানী তাঁর পরিবার নিয়ে ছিলেন কিছুদিন। ঢাকা প্রেসক্লাবে পাকিস্তানি সেনাদের নিক্ষিপ্ত শেলে আহত অবস্থায় কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে এসে উঠেছিলেন ছড়ার রাজা সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সিলেটের রাজা সফদার খান ও সুনীল লোহ প্রমুখও ছিলেন কিছুদিন।

ত্রিপুরায় মোট ২৫টির মতো মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প ছিলো। আগরতলা বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের সামনের রাস্তার গলিপথে ছিলো পিপল্স্ রিলিফ কমিটির

ক্যাম্প। গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে সেখানে উঠতেন। এই ট্রানজিট ক্যাম্পটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কাজি গোফরান। বিলোনিয়ায় রাজনগর অঞ্চলে কয়েকটি ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দেবেন শিকদার ও সুভাষ ভৌমিক।

কখনো কোনো ক্যাম্পে দলীয় রাজনীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়নি। আওয়ামী লীগ হোন, ন্যাপ হোন বা কোনো বামপন্থী গোষ্ঠীর ছাত্র হোন, কোনো জুট মিলের শ্রমিক বা গাঁয়ের তরতাজা কৃষক বা যুবক হোন—সবাই মুক্তিযোদ্ধা। ভেতর থেকে এলাকার কমাণ্ডাররা যখন যুবকদের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়েছেন, তখন কোনো দলীয় বাছ-বিচার ছিলো না।

মনে পড়ে সেদিনকার মেজর জিয়াউর রহমানের কথা, যিনি চট্টগ্রাম গ্যারিসন থেকে বেরিয়ে চট্টগ্রাম বেতারে ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের। প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয় বিপ্লবী সূর্য সেনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম থেকেই। প্রবল প্রতিরোধের মুখে তিনি সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হন। একদিন তিনি উপস্থিত হন সাব্রুম সিপিআই (এম) অফিসে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, যুদ্ধ করতে আপনাদের সাহায্য চাই। সাব্রুম থেকে আমাদের পার্টি নেতারা তাঁকে নিয়ে আসেন আগরতলার বটতলায় পার্টির রাজ্য দপ্তরে। সেখানে ছিলেন পার্টি নেতা নৃপেণ চক্রবর্তী, দশরথ দেব ও ভানু ঘোষ প্রমুখ। আমরা বিরোধী দল, আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হলো তাঁকে।

মার্চ থেকে জুলাই—এই ক'মাস বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের খুব কঠিন সময় গেছে। মূলত পাকিস্তানি সেনাদের কাছ থেকে যে অস্ত্র-গোলাবারুদ তাঁরা কেড়ে নিতে পেরেছেন, তাই দিয়ে প্রতিরোধ চালাতে হয়েছে। ট্রেনিংয়ের জন্যও অস্ত্র পাওয়া যেতো না, রসদ পাওয়া যেতো না। বরাদ্দ করা আহারের পরিমাণও খুবই অপ্রতুল। ভারতের সেনাবাহিনী তখনো অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেনি। কারণ, ভারত সরকারের তখনো সিদ্ধান্ত ছিলো না। বাংলাদেশ সরকারকে তখনো স্বীকৃতিও দেয়নি ভারত সরকার। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানি সেনারা বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে। যখন হতাশা ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন বামপন্থী আন্দোলনের নেতারা বারবারই স্মরণ করছিলেন মৌলানা ভাসানীর কথা, যিনি এই অবস্থায় পারবেন নৈতিক সাহস যোগাতে। অথচ তখন মৌলানা ভাসানীর খোঁজ নেই। অবশেষে জানা গেলো, খুলনা-যশোর হয়ে মৌলানা ভাসানী এগোচ্ছেন সীমান্তের দিকে, তাঁর সাথে রয়েছেন টাঙ্গাইলের ছাত্রনেত্রী হাজেরা সুলতানা ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আতিকুর রহমান সানু।

৯৩ হাজার সুশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনা, তাদের হাতে মার্কিন সরকারের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক ও জঙ্গী বিমান বহর, ছিলো বঙ্গ রাজাকার। খালি হাতেতো আর লড়াই করা যায় না। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দলগুলোকে

ভেতরে আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন থাকতেন, আমরাও সমান উদ্বিগ্ন। অনেকদিন বাদে খবর আসতো অনেক মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট খান সেনাদের (পাকিস্তানি সেনা) ঘায়েল করে অস্ত্র কেড়ে নিতে পেরেছেন। তেমনি মর্মান্তিক খবরও আসতো, কতোজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের জীবন দিয়েছেন।

জুন, জুলাই, আগস্ট মাস পর্যন্ত মূলত বাংলাদেশ জুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে। কিন্তু সবচাইতে বড় অসুবিধা অস্ত্র ও রসদ নেই। আন্তর্জাতিক জনমতও তেমনভাবে গড়ে তোলা যায়নি। চীন সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে উল্টো আরো অভিযোগ এনেছিলো, এটা ভারতের সৃষ্টি। সোভিয়েত ইউনিয়নও ভারত সরকারের মতো উদ্বাস্তুদের মানবিক সমস্যার কথা বলতো। কিন্তু কেউ তখনো পর্যন্ত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

১৫ থেকে ১৯ জুন সিপিআই (এম) পলিট ব্যুরোর কোয়েম্বাইটার অধিবেশন থেকে এক প্রস্তাবে বলা হয়, "ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ যেদিন বিদ্রোহে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা করলেন তাঁদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অধিকার, তারপর থেকে তিন মাস পার হয়ে গেছে। ইতিহাসে নৃশংসতম অত্যাচারের যতো কাহিনী আছে, সেই ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে আজও তাঁরা বহু বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন। ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে এমন বিশ্বাসঘাতক পায়নি, যাতে একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বোকা বানাতে পারে।" সি.পি.আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায় এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বলে, যাতে তাঁরা ফৌজি আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারে। সি.পি.আই(এম)-এর প্রস্তাবে আরো বলা হয়, "বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম একটি ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, এ সংগ্রাম শাসকচক্রের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়।"

ভারতের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অবশ্য যুক্ত বাংলার শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র করেছিলো। সি.পি.আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটি সাথে সাথে এর বিরোধিতা করে ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে "যুক্ত বাংলার মতো কোনো কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মহলের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধ্বনি ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো শ্লোগানকে কোনোরূপ আমল দেবেন না।"

পরিস্থিতি দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের বিরুদ্ধে তদন্ত পর্যবেক্ষক পাঠাতে রাষ্ট্রসংঘে দাবি তুললো। তাদের অভিযোগ, ভারত সরকার বাংলাদেশে সেনা আগ্রাসন চালাচ্ছে। সি.পি.আই(এম) পলিটব্যুরো

তার ২৩—২৬ জুলাইয়ের অধিবেশন থেকে মার্কিন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকারের কাছে আবারো জোরালো দাবি জানানো হয়।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ে যে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে, তা আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। আগস্টের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেননি। শিমলায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে শরণ সিং বলেছেন, পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরেই তারা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সব মিলিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতি। ভারতে তখন প্রায় বাংলাদেশের এক কোটি নারী-পুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তার মধ্যে পনেরো লক্ষের মতো শুধু ত্রিপুরাতেই। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা তখন ১৪ লক্ষের মতো, তার ওপর ছিলো সমপরিমাণ শরণার্থী। নানা সমস্যা, যোগাযোগের অব্যবস্থা, অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহ, জিনিসপত্রের চড়া দাম, পানীয় জলের অভাব, চিকিৎসার অভাব এবং স্কুল-কলেজগুলোর মাসের পর মাস বন্ধ থাকা। আর এসব সমস্যা আবর্তিত শরণার্থী শিবিরগুলোকে কেন্দ্র করেই। এই সাথে ছিলো প্রায় চারদিকে সীমান্ত বেষ্টিত ত্রিপুরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলা ও মর্টারের শেল বর্ষণ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি রাজাকার-আলবদরদের ভেতরে ঢুকে মাইন পুঁতে রেখে অন্তর্ঘাতের ঘটনা ; কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ হাসি মুখেই স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশবাসীর সাথে সেদিন সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় আমাদের পার্টি নেতা নৃপেণ চক্রবর্তী, দশরথ দেব, বীরেন দত্ত, ভানু ঘোষ, সমর চৌধুরী, অনিল সরকার, মানিক সরকার ও সমর চৌধুরীসহ সর্বস্তরের নেতৃত্ব সেদিন অসংখ্য সভা-সমাবেশের ভেতর দিয়ে জনমত গড়ে তুলছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে।

প্রতিদিন অসংখ্য মিছিল চলেছে আগরতলায়। পাশাপাশি অন্যান্য শহর-গ্রাম-গঞ্জেও একটিই দাবি, "ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দাও, সর্বাত্মক সমর্থন দাও।" আমাদের মিছিল পথ পরিক্রমার সময় বাংলাদেশের শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধারা মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে অভিনন্দন জানাতেন। এই রকম অবস্থায় একদিন মার্কিন মুলুক থেকে এলেন সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডি শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে। বিশাল পুলিশ-সি.আর.পি বাহিনীর পাহারায় তাঁর কনভয়। আমরা ক'জন সাংবাদিক ঢুকে পড়ে কেনেডিকে জিগ্যেস করলাম, আপনি শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে এসেছেন, অথচ আপনাদের সরকার পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। কেনো আপনাদের সরকার বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে

চাইছে ? জবাব ছিলো না সেদিন কেনেডির মুখে।

অক্টোবর-নভেম্বর মাস। বাংলাদেশের প্রতিরোধ সংগ্রাম তুঙ্গে। পাক সেনাবাহিনী আরো হিংস্র। মুক্তিযোদ্ধারা দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে অনেক অঞ্চল মুক্ত করেছেন। পাকসেনারা গ্রাম থেকে হটে গিয়ে শহরগুলোতে ঘাঁটি স্থাপন করছে। পারভেজ ভাই ও ইসরাফ ভাইরা ভেতর থেকে এলে খবর দিতেন কোথায় ক'জন পাকসেনাকে মুক্তিযোদ্ধারা খতম করেছেন, ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, শীতলক্ষ্যার বুকে নৌকোসহ পাকসেনাদের কতোজনকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে ইত্যাদি। তেমনি তারা ধরা গলায় জানাতেন, কতোজন মুক্তিযোদ্ধা তরুণ জীবন বলি দিয়েছেন, কতোজন মা-বোন পাক সেনাদের পাশবিক লালসার শিকার হয়েছেন।

নভেম্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন দুর্বার। জাঁকালো শীত, তবু সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের কাবু করতে পারেনি। পাক হানাদার বাহিনী বৃষ্টির মতো গোলা ছুঁড়ছে ভারতের দিকে। এলোপাতাড়ি আঘাত হানছে আগরতলা, সোনামুড়া, সাব্রুম, বিলোনিয়া, খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাসশহরের সীমান্ত অঞ্চলে। তখনই ভারতীয় সেনাবাহিনী পাল্টা আঘাত হানা শুরু করলো। দিনের বেলা সব স্বাভাবিক। সন্ধ্যা হলেই নিষ্প্রদীপ, রাতে কার্ফু। সাংবাদিক হিসেবে কার্ফু পাস সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। ভারত সরকারের নির্দেশে সীমান্ত রাজ্যগুলোতে প্রতিরক্ষা সহায়তায় বেসরকারি কমিটি গঠন করা হলো। ত্রিপুরায় আমাকেও সে কমিটির সদস্য করা হয়েছিলো, তাই কার্ফুর মধ্যেও ঘোরাঘুরি করার একটু বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেলাম।

ডিসেম্বর মাস। পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। ভারত সরকারের আর পিছু হটার পথ নেই। আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা থেকে প্রস্তাব গেলো। সংসদে সি.পি.আই (এম) সদস্যরা বারবার দাবি তুলছিলেন। পাশাপাশি পার্টি এটাও ভারত সরকারকে বলেছিলো যে, ভারত নিজ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। যদিও তখন পূর্ব সীমান্তে শুধু নয়, পশ্চিম সীমান্তেও পাকিস্তানি বাহিনী নিয়মিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলো।

এখনো চোখে ভাসে বাংলাদেশের তরুণ মুক্তিসংগ্রামীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাবার ছবি। আগরতলার রামনগর স্কুল, বড়দোয়ানী স্কুল, প্রগতি স্কুল ও আসাম রাইফেলসের মাঠে সন্ধ্যার পর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ভারি কামান ও মর্টারের ছবি আখাউড়ায় শক্তিশালী বাঙ্কার করে পাকিস্তানি বাহিনী সন্ধ্যার পর থেকেই গোলা ছুঁড়তে শুরু করতো। প্রতিরক্ষার জন্য তখন আগরতলার প্রায় সব বাড়িতেই ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কার। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী পাল্টা গোলা ছুঁড়ে জবাব দিতো। আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠতো। ভারতের গোলন্দাজ বাহিনীর কভারে

ভোররাতে মুক্তিযোদ্ধারা যেতেন রণাঙ্গনে। খালি গা, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, কোমরে লুঙ্গির ওপর বেল্ট বাঁধা, এক কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, খচ্চরের পিঠে কিছু রসদ। মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকে পড়ার ক' মিনিট পরেই মেশিনগানের ফায়ারের আওয়াজ আসতো।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। পাকিস্তান বেতার-টেলিভিশনে পাক সামরিক জান্তা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠস্বর—ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কী উত্তেজনা! বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু। তখন জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্র সব ফ্রন্টে লড়াই। প্রচণ্ড লড়াই ত্রিপুরা, আখাউড়া, সিলেট, কুমিল্লা, রামগড় ও ফেনী সেক্টরে। লড়াই চলছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় সীমান্তে, পশ্চিমে লাহোর রণাঙ্গনে। বাংলাদেশের অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাদের যৌথ অভিযানে জেনারেল টিক্কা খান ও জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত। ওরা পিছু হটছে, অগ্রসরমান ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাধা দিতে ভৈরব ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ররা ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছেন ট্যাঙ্ক, কামান ও সাঁজোয়া বাহিনী চলাচলের পথ করে দিতে।

পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরুর পাঁচ-ছ' দিনের ভেতরেই পাকিস্তানি বাহিনী একেবারে কোণঠাসা। মিঞাবাজারে হলো প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। যুদ্ধের রোমাঞ্চকর প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেশ ক' বারই ঢুকে পড়েছিলাম। সব পথই বিপদসঙ্কুল। পাকবাহিনী প্রায় সর্বত্র মাইন পেতে রেখেছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিজয় মিছিলে আমরা সবাই শামিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন প্রায় পর্যুদস্ত, তখন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো দুনিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের পয়লা নম্বরের দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। চট্টগ্রাম বন্দর অভিমুখে বিশাল সপ্তম নৌবহরকে পাঠালো মার্কিন সরকার। অজুহাত কি ? পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক ডজন মার্কিন নাগরিক রয়েছে, তাদের উদ্ধারের জন্য যাচ্ছে সপ্তম নৌবহর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে যে সংগ্রাম ব্যর্থ করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শেষ মরিয়া চেষ্টা। গর্জে উঠলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা, সমগ্র ভারতবাসী। পাল্টা হুমকি দিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারতের শহরে–প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল—"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো ! বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন।"

বাংলাদেশ, ভারত ও বিশ্ব জুড়ে তীব্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনকে বাধ্য করলো সপ্তম নৌবহর সরিয়ে নিতে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন চূড়ান্ত সাফল্যের পথে। কখন পাক

সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে আমরা সবাই তখন তারই প্রতীক্ষায়। আর তখনি এলো সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। ১৪-১৫ ডিসেম্বর রাতে পাকবাহিনী জঘন্যতম গণহত্যাভিযান চালিয়েছে ঢাকা মহানগরীতে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপককে পাক সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়ে গণহত্যা করেছে। সেদিন দেখেছিলাম আগরতলায় বাংলাদেশের যেসব শিল্পী–বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন, তাদের বুকে কী অসহ্য যন্ত্রণা ! অনেকে বুক চাপড়ে পর্যন্ত কেঁদেছেন।

বুকভরা বেদনা নিয়েই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করলেন। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের অধিনায়কদের কাছে পাকিস্তানি সেনানায়করা আত্মসমর্পণ করলো। আনন্দের জোয়ারে বাংলাদেশ-ভারতের জনগণ ভাবছেন আমরা আগরতলায় বিজয় মিছিলে পা ফেলছি।

এবার স্বদেশে ফেরার পালা। সাড়ে আট মাস ধরে মানবতার টানে, ভাবের টানে, সংস্কৃতির টানে, স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের অদম্য আকাঙ্ক্ষার টানে ত্রিপুরার বুকে বাংলাদেশের জনগণের সাথে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো এবার সেই বাংলাদেশের বন্ধুদের ঘরে ফেরার পালা। বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের সকলের চোখে আনন্দাশ্রু। কান্না, ঘাম ও রক্তে ভেজা আমাদের দু' দেশের জনগণের বন্ধুত্বে কোনোদিন কি ছেদ পড়বে ? এমন ভাবনা সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও মনে আসেনি, আজো আসে না। তবে কোনো কোনো মহল বন্ধুত্বের নামে অভিভাবকত্ব খাটাবার ইচ্ছা পোষণ করেননি, তা নয়। প্রস্তাব দেয়া হচ্ছিলো—বাংলাদেশে নতুন করে প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে, নতুন সরকারকে সাহায্য করতে ভারত থেকে অফিসার পাঠাতে হবে। আমরা বললাম, এ কী ! এতো একটা জাতির বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করার শামিল !

ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে, ত্রিপুরা ও আগরতলাবাসীর সাথে বাংলাদেশের জনগণের একাত্তরের রক্তঝরা দিনগুলোতে যে একাত্মবোধ ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সে বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, সমান মর্যাদা ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্কের ভেতর দিয়ে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, সামরিক ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ, সে বাংলাদেশ থাকবে অপরাজেয়।

গৌতম দাস, সম্পাদক 'দৈনিক দেশের কথা', আগরতলা

সত্যব্রত চক্রবর্তী সাংবাদিক, আগরতলা

দেশ ভাগ হবার কিছুদিন বাদেই কুমিল্লা থেকে আসা পাকিস্তানি পুলিশ পরপর দু'বার আমাদের বাড়িতে বড়ো ধরনের তল্লাশি চালিয়েছিলো। বাবা দীর্ঘদিন স্বদেশী করেছেন। সরকারের সন্দেহ ছিলো সম্ভবত। গ্রেফতারের ভয়ও। কয়েক মাস বাদে মাত্র চল্লিশ টাকা নগদ সম্বল নিয়ে আমরা দু'ভাই আর বাবা-মা একরাতের ভেতরে সীমান্তের এপারে মাধবপুর গ্রামে এসে উঠেছিলাম। এর প্রায় সাত-আট মাস বাদে আগরতলায়। দেশান্তরী হবার সে রাতের স্মৃতি অবিকল মনে পড়ে। সঙ্গে সামান্য কিছু জিনিসপত্র। মাধবপুরের সীমান্ত অবধি হেঁটে আসতে হয়েছিলো কয়েক মাইল। মা ছিলেন রুগ্ন। মাঝে মাঝেই বলছিলেন, আমি আর হাঁটতে পারি না। বাবা বলছিলেন, এসে পড়েছি প্রায়। আর একটু। কথা বলো না, কেউ শুনতে পেলে সন্দেহ করবে। বলবে, কে যায় এতো রাতে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিলো স্তিমিত বনজ্যোৎস্না। পথে লম্বা ছনের গাছ, মাঠময় কাশফুলের সমারোহে নেমে এসেছিলো নির্বাসনের রাত।

দেশ ছেড়ে যাবার কষ্ট বোঝার বয়েস তখন নয়। মনে হয়েছিলো, বেড়াতে যাবার মতোই কিছু ব্যাপার। বড়ো হয়ে বুঝেছি, কী মস্তবড়ো কাণ্ড হয়েছে আমাদের জীবনে। মাধবপুরে এসে প্রায়ই মন খারাপ লাগতো। আগের বাড়িঘর, পাঠশালা, খেলার সাথী কেউ নেই। মাধবপুরের সীমান্তে জয়কুমারদের পুকুরের কিনার ঘেঁষে বাঁকা হয়ে বিলের জল ঢুকে গিয়েছে। ওপাশে দৌলতপুর, মীরপুর, ঘাগুটিয়া—পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গ্রাম। পুকুরের এপাশ থেকে ঢিল ছুঁড়লে দৌলতপুরের গোপাটে গিয়ে পড়বে। কিন্তু যাওয়া চলবে না। দেশ এখন ভাগ হয়ে গেছে। ওখানে গেলেই নাকি মিলিটারি ধরে নিয়ে যাবে। অথচ সীমান্তের ওপাশে মিলিটারি আসতে দেখিনি কখনো। দৌলতপুরের কোল ঘেঁষে ঘাগুটিয়ার উপকূল ছাড়িয়ে দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বিল ছড়িয়ে রয়েছে, অগুণতি শাপলা-শালুক, আশ্বিনে

বিল জুড়ে পদ্মফুলের মেলা। এটাই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। দিনের বেশির ভাগ সময় জয়কুমারদের পুকুর পাড়ে বসে দু'ভাই মিলে দৌলতপুরের মানুষ, ঘাগুটিয়ার ঘাটে নৌকোর যাওয়া-আসা, ভিড় করে থাকা, আম, জাম, কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমাদের যেনো আর কিছুই করার ছিলো না। মনটা কেমন খালি খালি লাগতো। বুঝিয়ে বলার সাধ্য ছিলো না, সবসময় মনে হতো কী যেনো একটা কাণ্ড হয়েছে।

দেশ ভাগ হয়ে যাবার পরও যারা দ্বিতীয়বার আমাদের পরাধীন করেছিলো, সেই পশ্চিমা সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হলো বাংলাদেশে। ১৯৭১-এর মার্চ মাস। শেখ সাহেবের ঐতিহাসিক ভাষণ, "আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো।" দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রামে পথে নামলেন বাংলাদেশের অগণিত ছাত্র, তরুণ, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে। সীমান্তের এপারে লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া ছিলো অসামান্য, অভূতপূর্ব।

ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই লেখক, দার্শনিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আসন্ন রূপান্তরের মানসিক প্রস্তুতির পটভূমি নির্মাণ করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ প্রস্তুতিপর্বে বাঙালির সাংস্কৃতিক নির্মাণ, আপসহীন সঙ্কল্প, আত্মত্যাগ জনযুদ্ধের সচেতন মানসিকতাকে অনিবার্য করেছে। বিশেষ করে ছাত্র, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। লেনিন বলেছিলেন, ছাত্ররা হলো তাল গাছে ঝুলন্ত বাবুই পাখির বাসা। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত পেয়ে আগে থেকেই দুলতে থাকে। গণতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বিকাশের দাবিতে বাংলাদেশের মার খাওয়া মানুষের লড়াই, যা ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং মর্যাদার প্রশ্নে জাতিসত্তার অস্তিত্বের অনুকূল এক সংবেদনশীল আবেগকে সংহত, অপ্রতিরোধ্য করেছে।

তিনদিকে বাংলাদেশের মানচিত্রে ঘেরা, বেশিরভাগ বাঙালি অধ্যুষিত ত্রিপুরার মানুষ পরোক্ষভাবে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সমতল ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশ মানুষ দেশভাগের অনিবার্যতায় পূর্ববাংলার গ্রাম-ঘর ছেড়ে এসেছেন। পূর্ববাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, লোকায়ত জীবন-ভাবনার অবিচ্ছিন্ন ধারা এ-রাজ্যে প্রবাহিত। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে দক্ষিণাত্যের তামিল জাতীয় সম্পর্কের যোগাযোগ বিষয়ক প্রশ্নটি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একই রকমভাবে বিবেচ্য নয়। উভয় পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ ও গুণগত পার্থক্য তো আছেই।

THE STATESMAN-এ আমার সাংবাদিকতা আরম্ভ ১৯৬৭ ইংরেজি থেকে। পত্রিকার সে আমলের বার্তা বিভাগের সহকারী প্রধান এলিস আব্রাহাম কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। জাতিতে ইহুদি এই অমায়িক ভদ্রলোক আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বাংলাদেশে গণবিদ্রোহের সূচনায় তাঁর কাছ থেকে

জরুরি টেলিগ্রাম পেলাম। লিখলেন, কলকাতার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমি যেনো ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ঘুরে বিদ্রোহের প্রতিদিনকার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কলকাতার প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট পাঠাই।

৯ মার্চ, ১৯৭১। আগরতলার অদূরে কমলাসাগর সীমান্তপথে বাংলাদেশে ঢুকে যাওয়া সহজ ব্যাপার। এপারে কমলাসাগর দিঘির কিনার ঘেঁষে বাংলাদেশের কসবা রেলস্টেশনে হাজির হয়েছিলাম দুই সাংবাদিক। সীমান্তে কোনো বাধা নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে ঢুকতে পেরে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। রেলস্টেশনে কে বা কারা হামলা করেছে আগের দিন। স্টেশনের অফিস ঘরের কপাট ভেঙে খুলে নেয়া হয়েছে। প্লাটফর্মের অনেকখানি অবধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অফিস থেকে টেনে বের করা সরকারি কাগজপত্র, ট্রেনের অবিক্রীত টিকিট, বিধ্বস্ত অফিস রেজিস্টার ইত্যাদি।

এর আগের দু'দিন ঢাকার দিক থেকে কোনো ট্রেন আসেনি। শত শত উদ্বিগ্ন বাংলাদেশবাসী ট্রেন লাইনের ওপর, আশপাশে এখানে-ওখানে জড়ো হয়ে বসেছিলেন। আমরা খবরের কাগজের লোক জেনে অনেকেই জিগ্যেস করলেন, ঢাকার খবর কি ? কোন সুনিশ্চিত খবরই পাচ্ছিলেন না তাঁরা। শুরুতে কলকাতা এবং দিল্লির রেডিও বিদ্রোহের কোনো বিস্তারিত খবর দেয়নি। সেই থেকে '৭১-এর সারা বছর ধরে কতোবার কতোভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের গ্রামে ঢুকেছি, তার হিসেব নেই। কুমিল্লা, নোয়াখালী আর চট্টগ্রামের নানা গ্রাম-শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবরের সন্ধানে।

মার্চ মাসের শেষদিক থেকে ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যায় ছিন্নমূল শরণার্থীর প্রবেশ সূচিত হয়েছিলো। ভারত সরকার সুস্পষ্টভাবে রাজ্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ত্রিপুরার প্রবেশের পথে উদ্বাস্তুরা যাতে কোনো বাধা না পান। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা তখন প্রায় পনের লাখের ওপর। এর ওপর প্রায় চৌদ্দ লাখ শরণার্থী ত্রিপুরায় ঢুকেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে এরা বসবাস করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সমস্ত অংশের মানুষ ঠাঁই নিয়েছিলেন এইসব ত্রাণশিবিরে। এক অসামান্য আবেগের সংহতি তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রকাশ পেয়েছে সেই তখন। বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, ত্রিপুরার মানুষ, যাদের বড়ো অংশ দেশভাগের পরিণামে উদ্বাস্তু হয়ে এ-রাজ্যে এসেছেন তারা কেনো এর জন্য মূল্য দেবেন, কষ্ট বরণ করে নেবেন—এ ধরনের জিজ্ঞাসা বোধকরি কারোর মনেই ছিলো না। হাটে, পথে, শহরে, লোকালয়ে এমন প্রশ্ন কাউকে করতে শুনেছি একদম মনে পড়ে না। যদিও দুঃখের ভাগ বড়ো কম ছিলো না। বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর ত্রিপুরার সীমান্ত গ্রাম ছেড়ে প্রচুরসংখ্যক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে

যেতে হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিফৌজের তৎপরতার স্বার্থে।

প্রথমদিকে আগরতলা বিমানবন্দরে পাকিস্তানি বিমান আক্রমণ ছাড়াও আগরতলা শহরের ওপর পাকিস্তানি মর্টার শেল নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সীমান্তের গ্রামের ওপরতো শত্রুর আক্রমণ ছিলোই। স্থানীয় সীমাবদ্ধ বাজারের ওপর বাড়তি প্রায় চৌদ্দ লাখ মানুষের ভরণপোষণের দায় বহন করতে গিয়ে ত্রিপুরার মানুষ নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন। এরাজ্যে ছ' সাত লাখ উপজাতি নাগরিক রয়েছেন, যারা তাদের সামাজিক, আর্থিক অস্তিত্বের স্বার্থেই বিদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আগাগোড়া সোচ্চার। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দু' বার ত্রিপুরা সফরে এসেছেন। তাঁর ভাষায় "ভারত সরকার চান যতো দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ শেষ হোক, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভ করুন। আর ত্রিপুরায় অবস্থানরত শরণার্থীরা সসম্মানে, মাথা উঁচু করে তাদের মুক্ত স্বদেশে ফিরে যান।" আগরতলা সার্কিট হাউসে এক জনাকীর্ণ সংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য প্রত্যাশায় ত্রিপুরার মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন। সীমান্তের গ্রামে-শহরে পাকিস্তানি মর্টার ও কামানের আঘাত স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তাকে ব্যাপকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে।" ত্রিপুরাবাসীর এই সহিষ্ণু ও সাহসিকতাপূর্ণ আত্মত্যাগ স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবীকালের ইতিহাস স্মরণ করবে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার কথা বারবার উল্লেখও করেছিলেন।

ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মানুষ বেতারে যুদ্ধজয়ের প্রতিদিনের খবরে রোমাঞ্চিত হয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিলো। রাজ্যের ভেতরে এবং সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় শরণার্থী শিবিরসমূহ স্থাপিত হয়। অনেক বড়ো এলাকাজুড়ে বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুবিধাসহ এক একটি শিবিরে কয়েক হাজার করে মানুষ ঠাঁই নিয়েছিলেন। সদর মহকুমার সিধাই সীমান্ত অঞ্চলে একটি শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে এসে গুলি চালিয়েছিলো। এতে সম্ভবত দু' জন শরণার্থী নিহত হন, আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। শিবিরটিকে পরে ভেতরে সরিয়ে আনা হয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। আগরতলা শহরের কাছে জলিলপুরে এক শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি বাহিনী অনুরূপ হামলা চালায় ১৪ আগস্ট, ১৯৭১। ১৩ জন শরণার্থী গুলিতে প্রাণ হারান।

পশ্চিমবঙ্গের কথা আমার সঠিক জানা নেই, তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যে আগরতলা পূর্ববাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ফলপ্রসূ তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে যখন ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা, আগরতলায় তখন প্রাত্যহিক পরিস্থিতির রাজনৈতিক

মূল্যায়ন করে চলেছেন মুক্তিসংগ্রামের নেতৃবৃন্দ। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের 'মুজিবনগর'-এর নাম ঘোষিত হয়েছিলো, কিন্তু মুজিবনগরের নামে সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়েছিলো আগরতলা থেকেই। ২ এপ্রিল, ১৯৭১ ভারতে এবং অন্যান্য বিদেশী প্রচার মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি আবেদন বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। অবিলম্বে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা বন্ধের জন্য নেতৃবৃন্দ জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল ও বিশ্ববাসীর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। আগের দিন অর্থাৎ ২ এপ্রিল আগরতলায় নেতৃবৃন্দের এক যৌথ বৈঠকে দাবিপত্রের খসড়াটি অনুমোদিত হয় এবং সে রাতেই সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে এখান থেকে তা প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শুধু ভারতীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমেও আগরতলা ডেটলাইনযুক্ত খবরের বিশেষ কদর ছিলো। মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম. আর. সিদ্দিকী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও বাংলাদেশের বামপন্থী নেতারা ত্রিপুরায় তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন প্রধান এবং এ উপমহাদেশের বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা মণি সিংহ, পার্টির পুরনো আমলের নেতা খোকা রায়, ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ, যেমন হারুন-উল-রশিদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, পার্টির অন্যতম নেতা বারীণ দত্ত ওরফে আবদুস সালাম, বামপন্থী নেতা প্রয়াত জ্ঞান চক্রবর্তী, তৎকালীন ন্যাপ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তসহ আরো অনেক নেতা আগরতলায় বসে কাজ করেছেন। মণি সিংহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে পার্টির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্তর্জাতিক মতামত গড়ে তোলার কর্মসূচী নিয়ে মোজাফফর আহমেদ এখান থেকে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফরে গিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আগরতলা খেলার মাঠে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাসভবন এবং সন্নিহিত এম.এল.এ হোস্টেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মুক্তিবাহিনীর নেতা, কর্মী ও যোদ্ধাদের এক সর্বক্ষণের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। মুক্তিবাহিনীর এ অঞ্চলে যুদ্ধরত এমন কোন নেতা নেই, যিনি অন্তত একবারের জন্যে হলেও এ বাড়িতে আসেননি। এম.এল.এ হোস্টেলে আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই অস্থায়ীভাবে ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবসময় অনিল ভট্টাচার্যের বাড়িতে বসে সলাপরামর্শ করেছেন। অনেক জরুরি বৈঠক এখানে

হয়েছে। ২ এপ্রিল, ১৯৭১ জাতিপুঞ্জের কাছে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে যে জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছিলো, অনিল ভট্টাচার্যের বাসভবনে বসেই তার মূল খসড়াটি তৈরি হয়। সেই এম.এল.এ হোস্টেলটিই এখন নজরুল ছাত্রাবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের অনেকেই এম.এল.এ হোস্টেলে তাঁদের অস্থায়ী ঠাঁই করে নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে আগরতলায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো, নানা কারণেই তা বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারে। এ ধরনের আন্দোলনের মৌল প্রবণতা, যা লক্ষণীয় হয়েছিলো, তা হলো, মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ সৈনিকদের জন্য এপারের শুভার্থী মানুষের সংবেদনশীল একাত্মতা দেশভাগের সীমান্তরেখা আর মৌলবাদী ধর্ম সংস্কার যে মানুষের মনের ভেতর আপন-পরের দেয়াল তুলতে পারেনি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তা প্রমাণ করতে পেরেছিলো।

আগরতলায় আকাশবাণী কেন্দ্র, বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কবি-লেখক-শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে রেখে কবিতা লিখেছেন, নাটক, পথসভা করেছেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বাংলাদেশের দুর্গত মানুষকে অর্থ সাহায্যের জন্য। শিল্পী, সমাজকর্মীরা পথে পথে ঘুরে ত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আগরতলায় আকাশবাণী কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিয়মিত গান, নাটক, কবিতা এবং আলোচনামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

জনযুদ্ধের সমর্থনে এ সময়ে 'সন্দ্বীপ থেকে ধলেশ্বরী' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো আগরতলায়। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব এবং বিশিষ্ট লেখক কৃষ্ণপদ দত্ত, সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য, ঔপন্যাসিক কার্তিক লাহিড়ী, গল্পকার বিমল চৌধুরী, কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ও মিহির দেব প্রমুখের উৎসাহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য ও চিরব্রত রায় বর্মণের সম্পাদনায় 'সন্দ্বীপ থেকে ধরেশ্বরী'র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নগ্ন হ'ল শিকলে বাঁধা দানব,' জীবনানন্দের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'র উদ্ধৃতিসহ প্রকাশিত সাময়িকীতে আলাউদ্দীন আল আজাদের কবিতা, বেগম সুফিয়া কামালের লেখা, রণেশ দাশগুপ্তের 'মুক্তিযুদ্ধের একমুখিতার প্রশ্নে' শীর্ষক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় সাময়িকীটি সমৃদ্ধ হয়েছিলো। কাজি রোজীর কবিতায় আর্তি ছিলো, "আমার ভাবী সন্তান যেনো মুক্তিযোদ্ধা হয়।" ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাংবাদিক এবং শিল্পীরা মাত্র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত সাময়িকীটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহনীর মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত

মুক্তিযুদ্ধের ওপর স্থানীয় শিল্পীদের এক চিত্র প্রদর্শনীতে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর আনিসুজ্জামান 'সন্দ্বীপ থেকে ধলেশ্বরী'র প্রথম সঙ্কলনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছিলেন।

প্রায় বারো বছর আগে আমার বাবা প্রয়াত হয়েছেন। নিবে যাবার আগে জীবনের শেষতম দিনগুলোতে প্রায়ই পূর্ববাংলার কথা, গ্রাম, গঞ্জ, হাওড়, শিবপুরের গল্প বলতেন। আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে বাংলাদেশের শিবপুরের এক পাঠশালায় জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন তিনি। রোগশয্যায় কেবলই বলতেন, চোখ বুজলেই দেখতে পান ময়দাগঞ্জের হাট, নাটঘর, রাজমঙ্গলপুর, শিবপুরের নানা স্মৃতি। আমার ছেলে বড়ো হচ্ছে। ওর হৃদয়ে মেঘনা, তিতাসের স্পন্দন নেই। বই পড়ে, গল্প শুনেই শুধু সে জানবে পিতৃপুরুষের জন্মভূমির কথা। এখনো মাঝরাতে যখন অকারণে ঘুম ভেঙে যায়, অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। আমি চোখ বুজে অন্ধকারে ক্রমাগত সেই ছিপছিপে বালকটির মুখ ভাবতে থাকি, যে তার বাবার হাত ধরে উত্তরের মাঠের আলপথ দিয়ে, দু' পায়ে ভোরের শিশির মাড়িয়ে কেবল হাঁটছে হাঁটছে।

সত্যব্রত চক্রবর্তী কবি ও সাংবাদিক, আগরতলা

মোহাম্মদ টুকু মিঞা এম. এ. বি. টি, আগরতলা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান বিশ্ব-জনবিদিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কারণ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সে সময় 'স্বাধীনতা পাগল' বীর মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের দেশের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা বিপন্ন হওয়ার মতো দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। এমন কি এ-জন্য তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার হুমকি পর্যন্ত মোকাবেলা করতে হয়েছিলো দৃঢ় প্রত্যয় আর সাহসিকতার সঙ্গে। সে ঘটনা আজ ইতিহাস।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকবাহিনী নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে বাঙালিদের ওপর যখন পাশবিক ও অমানবিক নির্যাতন চালায়, তখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। এই লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয়, ভরণপোষণ আর চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন ভারত সরকার। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও শরণার্থীদের সাহায্যে যেভাবে উদারহস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলো, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ এই শরণার্থীদের আপন আত্মীয় বলে, বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনোভাবে আপনাপন সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমনের ঘটনাকে এখানকার কোনো মানুষ বিরূপ নজরে দেখেননি। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, এমন কি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়েও তাঁদের জন্য শিবির করে দেয়া হয়েছিলো। ফলে প্রথমাবস্থায় প্রায় ছ'মাস ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ ছিলো। এ রকম একটা অবস্থাও ছাত্রসমাজসহ এখানকার অভিভাবকবৃন্দ হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত শিবিরে হিন্দু-

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একাত্ম হয়ে গাদাগাদি করে সহ–অবস্থান করেছেন। একই শিবিরে উলুধ্বনি আর আজানের আওয়াজ যেনো একটা পবিত্রতা বহন করে এনেছিলো। আর এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরাও সবধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে সেই পবিত্রতাকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন আকাশে–বাতাসে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার লক্ষ্যে এখানকার মানুষজনকে পারিবারিকভাবেও অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়েছে। অসংখ্য শরণার্থী আগমনের ফলে এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিলো। তা ছাড়া এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কমই ছিলো, যেখানে কম করে হলেও ২/৪ জন শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়নি। আপন পরিবারের এবং শরণার্থী অতিথিবৃন্দের ভরণপোষণ করতে প্রতিটা পরিবারকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিলো। বিশেষ করে এখানকার দিন–মজুরদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ অবস্থায় নেমে এসেছিলো। কারণ গরিব শরণার্থীদের অনেকেই শারীরিক পরিশ্রমজনিত কাজে নিজেদের নিয়োজিত করায় শ্রমিকের মজুরি অনেক কমে গিয়েছিলো। ফলে তখনকার দুর্মূল্যের বাজারে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করে এখানকার শ্রমিকদের অনাহারে–অর্ধাহারেই কাটাতে হয়েছিলো দিন। এসব সত্ত্বেও শরণার্থীদের প্রতি তাঁদের সহমর্মিতার বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা যায়নি। এমনিভাবে এখানকার জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সামাজিক, পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছিলো বাংলাদেশের ভাই–বোনদের স্বার্থে। তাঁদের উদারতা, সহনশীলতা, আতিথেয়তা এবং মানবতাবোধ বাংলার দামাল ছেলেদের লক্ষ্য অর্জনে সন্দেহাতীতভাবে অপরিসীম অবদান রেখেছিলো।

ঘটনাচক্রে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও জড়িয়ে গিয়েছিলাম শরণার্থী এবং মুক্তিবাহিনীকে সহায়তার কাজে। একদিন হঠাৎ খবর এলো যে, রহিমপুর সীমান্ত অতিক্রম করে কিছুসংখ্যক ইপিআর সদস্য এপাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যাপারটি দেখার খুব কৌতূহল হলো। আমি এবং আমার দুই সহকর্মী শ্রীহরিপদ দেব বর্মা ও শ্রী অনিল কুমার চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন ছাত্র যেমন পল্টু সরকার ও নীলেন্দ্র চৌধুরী এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলাম রহিমপুরে। দেখলাম, ইপিআর এবং পুলিশ মিলিয়ে মোট ১১ জন লোক গোলা–বন্দুকসহ সীমান্তের গা–ঘেঁষা একটা ছোট্ট টিলার ঢালে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সাথে আলাপ হলো। দেখতে পেলাম, তাঁদের পাশে কিছু কলার খোসা আর রুটি মোড়ানো ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে। জানতে চাইলাম, তাঁরা ভাত খেয়েছেন কি না ? উত্তরে জানতে পারলাম, গত দু' দিন তাঁরা ভাতের মুখ দেখেননি। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় সেদিন তাঁদেরকে ডাল–ভাত আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

ফেরার পথে অসংখ্য শরণার্থীর সাথে দেখা হলো। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমরা চোখের পানি সম্বরণ করতে পারিনি সেদিন। আমাদের সবারই পকেট শূন্য করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ ও বিস্কুটসহ অন্যান্য খাবার কিনে দিলাম। আসতে আসতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম, কী করা যায় ! কীভাবে এই নিরীহ শরণার্থীদের সাহায্য করা যায় ! ঠিক হলো পরদিন সমস্ত এলাকাবাসীকে নিয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। পরদিন যথারীতি সভা হলো। সভায় সর্বসম্মতভাবে ৩১ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হলো একটি কমিটি। কমিটির নাম দেয়া হলো 'শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতি'। ঠিক হলো, সমিতির নামে রসিদ ছাপিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে শরণার্থী এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হবে। কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকে আর সম্পাদক হলেন আমারই সহকর্মী শ্রী হরিপদ দেব বর্মা। অন্য সদস্যদের ভেতরে ছিলেন সর্বশ্রী বিজয় লস্কর, প্রিয়লাল বণিক, জয়চন্দ্র দেবনাথ, নীলেন্দ্র চৌধুরী, পল্টু সরকার, সুকুমার চৌধুরী, ডাঃ সিরাজ উদ্দিন আহাম্মদ ও নূরুল ইসলাম প্রমুখ। রসিদ ছাপানো হলো। শুরু হলো আমাদের কর্মযজ্ঞ। কলমচৌরা থেকে কোনাবন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন কমিটির প্রতিটি সদস্য এবং এলাকার দরদী জনসাধারণ। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদার হাতে দান করেছেন এই কমিটিকে।

আমরা যখন এই কর্মকাণ্ডে পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তখন বিশালগড়ের বি.ডি.ও শ্রী দেবপ্রসাদ দত্ত, যিনি অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান অফিসার হিসেবে খ্যাত, আমাকে ডেকে আমার বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউজে শরণার্থীদের জন্য একটি লঙ্গরখানা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। বদনামের ভয়ে আমি নিজে সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করি। শেষ পর্যন্ত তাঁর পীড়াপীড়িতে আমার কমিটির সদস্য শ্রী নীলেন্দ্র চৌধুরীসহ ৪/৫ জনকে দায়িত্ব দিলাম প্রস্তাবিত লঙ্গরখানা পরিচালনার। বি.ডি.ও সাহেবের উদার সাহায্যে লঙ্গরখানা খোলা হলো। নীলেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিদিন শ' শ' শরণার্থীকে খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো।

শরণার্থী আগমনের স্রোত বন্ধ হওয়ার পর আমাদের তৎপরতা প্রধানত সীমাবদ্ধ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ প্রচেষ্টায়। সালদা নদী সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন আবদুল গাফ্ফার। তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন চাহিদা সেদিন সামর্থ্য অনুযায়ী মেটানো হয়েছে। ১৯৭১ সালের শেষদিকে, সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে কামথানা ফরেস্ট বিট

অফিসে গিয়েছিলাম। গাফ্ফার সাহেব তখন সেখানে ছিলেন না। ছিলেন দু'জন মুক্তিযোদ্ধা এবং আবদুল মতিন ভুঁইয়াসহ কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা। বসে গল্পগুজব করছিলেন তাঁরা। পাশেই বুড়িমা নদী। ওখানে এর তীরে বসে একজন লোক মাছ ধরছিলেন। হঠাৎ দেখলাম, তার জালে একটা বড় বোয়াল মাছ ধরা পড়েছে। আমরা সবাই মাছটি দেখতে গেলাম। তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা ভাই অন্যজনকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, "ইস ! যদি সঙ্গে টাকা থাকতো, তবে মাছটি কিনে নিতাম।" কথাটা আমার কানে আসতেই আমি ২৫ টাকা দিয়ে মাছটি কিনে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে নিয়ে এলাম। তারপর সকলের সামনে ঐ মুক্তিযোদ্ধা ভাইটিকে ডেকে এনে মাছটি নিয়ে নিতে বললাম। তিনি লজ্জায় মাছটি নিতে চাইছিলেন না। তখন মতিন সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলায় শেষ পর্যন্ত তিনি মাছটি নিয়ে ক্যাম্পে চলে গেলেন।

এখানে এই ছোট এবং তুচ্ছ ঘটনাটির অবতারণা করা হলো মুক্তিবাহিনীর প্রতি আমাদের আন্তরিকতার প্রতীক হিসেবে। হতে পারে ঘটনাটি তুচ্ছ; কিন্তু আমাদের আন্তরিকতা ছিলো আকাশচুম্বী। মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের জন্য সাহস, উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দীপনা জুগিয়েছিলো এই আন্তরিকতাই। এ ধরনের বহু ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষলগ্নে আমাদের আদায়কৃত অর্থের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ৩৫০০ লুঙ্গি এবং সমসংখ্যক গেঞ্জি কিনে মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের দেবার প্রস্তুতি নিয়ে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করা হলো। আলোচনা করে ঠিক করা হলো একটা তারিখ। সেই নির্দিষ্ট দিনে আমার কমিটির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কামথানা ফরেস্ট বিট অফিসে যাই। সেখানে জনাব আবদুল মতিন ভুঁইয়াসহ বেশ ক'জন বিশিষ্ট নেতার উপস্থিতিতে লুঙ্গি এবং গেঞ্জিগুলো ক্যাপ্টেন গাফ্ফার সাহেবের হাতে তুলে দেয়া হলো।

ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর আমাদের তরফ থেকে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

তারপর আরম্ভ হলো শরণার্থীদের ঘরে ফেরার পালা। বিভিন্ন শিবির থেকে তাঁদের বিদায় নেবার সেইসব দৃশ্য কল্পনা করতে আজও হৃদয় আপনাআপনি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় লোকজনদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেদিন অশ্রুর বিনিময়ে অশ্রু দিয়েই আমরা তাঁদেরকে বিদায় দিয়েছিলাম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ প্রায় ২০ বছর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উভয় বাংলার মানুষের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠেছিলো, আজ সময়ের ব্যবধানে যেনো তার অনেকটাই ম্লান। এপার বাংলা আর

ওপার বাংলার মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ আর অবিশ্বাসের প্রাচীর যেনো দিন দিন আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। তাই অনতিদূর অতীতের কথা স্মরণ করে সব রকম বিদ্বেষ আর অবিশ্বাসের উঁচু হয়ে ওঠা প্রাচীরটাকে গুঁড়িয়ে আমরা যেনো আবার একাত্ম হতে পারি, সেই কামনাই আজকের দিনে করছি। আর সেই সঙ্গে কামনা করছি বাংলাদেশের ভাই-বোনদের অপার সুখ ও সমৃদ্ধি।

মোহাম্মদ টুকু মিয়া, এম. এ. বি. টি
প্রধান শিক্ষক, কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিশালগড়, ত্রিপুরা
